POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
خُذُوْا حِذْرَكُمْ
فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ
اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا○

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা তোমাদের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ কর, অতঃপর, ভিন্ন ভিন্ন দলে বাহির হও অথবা সম্মিলিতভাবে বাহির হও।

(সূরা নিসা, আয়াত: ৭২)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 5

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 41

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

8 অক্টোবর, 2020 ● 20 সফর 1442 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

রসূল করীম (সা.)এর নামায

হযরত আবু মুয়াম্মর থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আমি হযরত খাব্বাব বিন আরত (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী করীম (সা.) যোহর ও আসরের নামাযে কি কুরআন মজীদ পাঠ করতেন? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হুযুর (সা.) যে পাঠ করতেন তা আপনি কিভাবে জানতে পেরেছেন? তিনি উত্তর দিলেন, আমি বুঝতে পেরেছি তাঁর চুল নড়তে দেখে।

আবু কাতাদা থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা.) যোহর ও আসরের দুই রাকাতে সূরা ফাতেহা এবং এবং অন্য কোনও সূরা পাঠ করতেন আবার কখনও কোন আয়াত শোনাতেন।

হযরত বারাআ (রা.)থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি নবী (সা.) কে এশার নামাযে সূরা 'ওয়াত্তীনে ওয়াযযাইতুন' পড়তে শুনেছি। আর আমি তাঁর থেকে উত্তম কণ্ঠ ও কিরাআত সহকারে কাউকে পড়তে শুনিনি।

হযরত জাবির বিন সামরা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর (রা.) হযরত সাআদ (বিন আবি ওয়াক্কাস) কে বলেন, লোকেরা আপনার প্রত্যেকটি বিষয় নিয়ে অভিযোগ করেছে, এমনকি নামাযের বিষয়েও। হযরত সাআদ বলেন, 'আমি প্রথম দুই রাকাত দীর্ঘ পড়াই এবং পরের দুই রাকাত খাটো পড়াই। আর আমি রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর নামাযের অনুসরণে কোনও অবহেলা করি না। হযরত উমর (রা.) বললেন,আপনি সত্য বলেছেন। আপনার সম্পর্কে আমার এই ধারণাই ছিল।

(সহী বুখারী, কিতাবুল আযান)

এই সংখ্যায়

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর চ্যালেঞ্জ
খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ (পূর্ণাঙ্গ)
হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত

উচ্চ মানের নৈতিকতা অর্জন কর, কেননা এর মধ্যেও খোদার কৃপা নিহিত আছে। নিজের অভ্যাসগুলিকে সুসংহত কর। ক্রোধ পরিহার কর, এর পরিবর্তে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন কর। দোয়া ও তওবা কর এবং সদকা দেওয়া অব্যাহত রাখ, যাতে আল্লাহ্ তা'লা নিজ কৃপাগুণে তোমাদের প্রতি দয়ার্দ্র আচরণ করেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

আমার মতে সরকারি আইনের বিরোধীতা করা বিদ্রোহের সামিল যা এক ভয়ানক অপরাধ। তবে সরকারেরও কর্তব্য এমন আধিকারিকদের নিযুক্ত করা, যারা আচারনিষ্ঠ,সভ্য এবং সমাজের রীতি রেওয়াজ এবং ধর্মীয় বিধিনিষেধ সম্পর্কে সচেতন। যাইহোক, তোমরা নিজেরাও সেই সব আইন মেনে চল এবং নিজেদের বন্ধুবান্ধব এবং প্রতিবেশীদেরকে এই আইনগুলির উপযোগীতা সম্পর্কে অবহিত কর। আমি পুনরায় বলছি, এটিই দোয়ার সময় বলে মনে হয়। এই মহামারি (প্লেগ-অনুবাদক) এখন পাঞ্জাবের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তাই প্রত্যেকের সতর্ক ও সচেতন হয়ে দোয়া এবং তওবা করা আবশ্যক। কুরআন শরীফের অবস্থান হল, ঐশী শাস্তি যখন শিয়রে এসে দাঁড়ায়, তখন তওবা বা প্রায়শ্চিত্ত তা থেকে নিষ্কৃতি দিতে পারে না।

অতএব, ঐশী শাস্তি এসে তওবার দরজা বন্ধ করে দেওয়ার পূর্বেই তওবা কর। যখন জগতের আইনের সম্মুখে এমন ভীতি তৈরী হচ্ছে,তবে কেন খোদা তা'লার আইনকে ভয় করবে না? ঐশী শাস্তি পৌঁছে যাওয়ার পর তা ভোগ করা ছাড়া উপায়ন্তর থাকে না। প্রত্যেক ব্যক্তির তাহাজ্জুদে ওঠার চেষ্টা করা উচিত এবং দিনের পাঁচ ওয়াক্তের নামাযে রুকু থেকে ওঠার পর বিশেষ দোয়া সংযোজন করা উচিত। খোদাকে অসন্তুষ্ট করে এমন প্রত্যেক প্রকারের বিষয় থেকে তওবা কর। তওবার অর্থ, সেই সব মন্দকর্মসমূহ, এবং খোদাকে অসন্তুষ্ট করে এমন কারণসমূহকে বর্জন কর এবং প্রকৃত পরিবর্তন আনয়নের জন্য সম্মুখে অগ্রসর হও এবং তাকওয়া অবলম্বন কর। উচ্চ মানের নৈতিকতা অর্জন কর, কেননা এর মধ্যেও খোদার কৃপা নিহিত আছে। নিজের অভ্যাসগুলিকে সুসংহত কর। ক্রোধ পরিহার কর, এর পরিবর্তে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন কর। আচরণ সংশোধনের পাশাপাশি নিজের সামর্থ্য অনুসারে সদকা দেওয়াও অভ্যাস কর। يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا (সূরা দহর, আয়াত: ৯) অর্থাৎ খোদার সন্তুষ্টির জন্য মিককিন, এতীম এবং বন্দীদের আহার করায় এবং বলে, কেবল আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আমরা আহার করাই এবং (বলে) সেই দিনটিকে ভয় করি যা অত্যন্ত ভয়াবহ। সংক্ষেপে বলা যায়, দোয়া ও তওবা কর এবং সদকা দেওয়া অব্যাহত রাখ, যাতে আল্লাহ্ তা'লা নিজ কৃপাগুণে তোমাদের প্রতি দয়ার্দ্র আচরণ করেন।

(মালফুযাত,১ম খণ্ড,পৃ: ১৯২)

তোমাদের এটা নির্ধারণ করে নেওয়া উচিত যে এমন কোনও সদগুণ যেন অবশিষ্ট না থাকে যেখানে অন্যরা তোমাদের থেকে এগিয়ে যায়।

قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا
وَمَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ
وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى
وَعِيْسٰى وَمَآ اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا
نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ

সূরা বাকারার ১৩৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন-

"এই আয়াত থেকে স্পষ্ট যে,মুসলিম সেই ব্যক্তি, যে খোদা তা'লার সকল নবীর উপর ঈমান আনে এবং নবী হিসেবে তাদের কারোর মধ্যে পার্থক্য করে না। যে সকল আম্বিয়াগণ সম্পর্কে সে জানে, তাদের নবুয়তের নাম নিয়ে তা স্বীকার করে আর যাদের সম্পর্কে জানে না, তাদের নবুয়তের উপর সামগ্রিকভাবে ঈমান আনে। অর্থাৎ এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, প্রত্যেক জাতিতে খোদা তা'লার কোনও না কেনও নবী অবশ্যই আবির্ভূত হয়েছেন আর আমরা সকলকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করি এবং তাঁদের আনীত শিক্ষাকে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে বলে বিশ্বাস করি। কাজেই যে ব্যক্তি নিজের যুগে বা পূর্বের যুগের সমস্ত নবীর নবুয়তের স্বীকারুক্তি দেয় এবং কোনও নবীর নবুয়তকে অস্বীকার করে না, সেই ব্যক্তি মুসলিম। কেননা সমস্ত নবীর নবুয়তের স্বীকারুক্তি নেওয়ার পর আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন- '**নাহনু লাহু মুসলিমুন।**' অর্থাৎ আমরা তাঁর অনুগত। যা থেকে বোঝা যায় যে, এই স্বীকারুক্তির পর কোনও ব্যক্তি মুসলিম হয়। আর এটি কেবল ইসলাম ধর্মের বৈশিষ্ট্য, এই ধর্ম পৃথিবীর সকল নবীর সত্যতা

শেষাংশ ৮ পাতায়

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

এক পয়সার নোবেল প্রাইজ !

মূল : মাজিদ রশীদ

অনুবাদ : মোরতোজা আলী

মৌলবী আব্দুল লতীফ সাহেব অঙ্কের একটি প্রশ্ন বোর্ডে লিখে বলেন, "এটা অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন। যে এটা সমাধান করবে, আমি তাকে এক পয়সা পুরস্কার দেব।"

মৌলবী সাহেবের এই ঘোষণায় সপ্তম শ্রেণীর ছেলেরা প্রবল উৎসাহে নিজ নিজ খাতায় সমাধান করতে ব্যস্ত হয়ে গেল। কয়েক মিনিট পর গোলাকার মুখমণ্ডল ও উজ্জ্বল চক্ষুবিশিষ্ট সালাম সাহেব দণ্ডায়মান হয়ে মৌলবী সাহেবের দিকে নিজ খাতা নিয়ে অগ্রসর হলেন। মৌলবী সাহেব প্রশ্নের সমাধান দেখে সালামের হাতে একটি পয়সা দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার মুখমণ্ডলে চুম্বন করে বলেন, "বৎস, এই এক পয়সাকে তুমি এই মনে কর যেন আমি তোমাকে একটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছি।"

মৌলবী আব্দুল লতীফ সাহেব আজ যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে দেখতেন, শিশু সালামকে তিনি যে এক পয়সা দিয়েছিলেন, সেটা আজ 'ফিজিক্স' (পদার্থ বিদ্যা) এর নোবেল প্রাইজে রূপান্তরিত হয়েছে।

পাকিস্তানের ডঃ আব্দুস সালাম যাকে গত বছর নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়েছে, স্বীয় শিক্ষক মৌলবী আব্দুল লতীফ সাহেবকে স্মরণ করে বলেন, "আজ যদি তিনি বেঁচে থাকতেন, তাহলে আমি তাঁর পদচুম্বন করতাম।"

ডঃ আব্দুস সালাম সাহেবের এই আবেগ প্রশংসনীয়। তিনি হয়ত এই বিষয় বিস্মৃত হননি। অঙ্কের সেই কঠিন প্রশ্নের সমাধান করে অতীতে মূল্যবান এক পয়সা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। হয়ত এই এক পয়সার পুরস্কার তাকে 'অ্যাটম' (পরমাণু) এর এক কঠিন সূত্রের সমাধান করিয়েছে। এই 'থিয়োরী'ই তাকে নোবেল প্রাইজ দ্বারা ভূষিত করেছে।

ডঃ আব্দুস সালাম সাহেব স্কুলে পড়াকালে নিজ অঞ্চলে চল্লিশ হাজার ছেলেদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। সেইজন্য তাকে দেখার জন্য সারা শহর উপচে পড়েছিল। জনসাধারণ এই প্রতিভাবান ছেলেকে দেখতে চেয়েছিলেন। যদ্বারা ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্খা সম্পর্কযুক্ত ছিল।

সম্প্রতি ডঃ আব্দুস সালাম নোবেল প্রাইজ নিয়ে পাকিস্তান পৌঁছিলে তাকে বৃক্ষরাজি, ল্যাম্প পোষ্ট আর প্রসাদ সমূহ অবলোকন করে, যেগুলো এয়ারপোর্ট থেকে তার বাড়ী পর্যন্ত সারিবদ্ধভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল। এমনটা কেন হোল, পাকিস্তানের নাগরিকরা বলতে পারেন অথবা জেনারেল জিয়াউল হক সাহেবের ইসলামী ব্যবস্থাপনা।

আমার স্মরণ আছে যখন পাকিস্তানি ক্রিকেট টীম ইং ১৯৭৯ সালে ভারতীয় ক্রিকেট টীমকে নিজ মাত্রভূমিতে পরাস্ত করেছিল। টীমের ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ মুশতাক যখন মাঠ থেকে নিজ গৃহাভিমুখে রওনা হয়েছিলেন, তখন তার গাড়ীর চাকা পুষ্পরাজি ব্যতীত ভূমি স্পর্শ করেনি। সেই ব্যক্তিকে এই শ্রদ্ধাঞ্জলি উপস্থাপিত করা হয়েছিল, যিনি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বিজয় লাভ করেছিলেন। ক্রিকেট তো শুধু শতকরা ২০ (কুড়ি) জন লোকের চিত্ত বিনোদন করে। ক্রিকেট সিরিজ জয়লাভ করা যেন নোবেল প্রাইজে অপেক্ষা বেশী সম্মানজনক ব্যাপার!!

কথিত আছে ডঃ আব্দুস সালাম সাহেবের সাথে বিমাতৃসুলভ ব্যবহার এইজন্য করা হয়েছে, কেননা তিনি কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্ক রাখেন।

যদি এটা সত্য হয়, তাহলে সংবাদ পত্রের খবরে প্রকাশ যে, ডঃ আব্দুস সালাম সাহেব নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত হওয়ার অব্যবহিত পরে দুই রাকাত শোকরানা (নফল) নামাজ পড়েছিলেন। এই বিতর্ক ছেড়ে দিন। এটা হাসরের ময়দানের পূর্ব্ব পর্যন্ত মৌলবীদের বিতর্ক। এই দিক দিয়ে আমি বুঝতে পারিনা, এতে ডঃ আব্দুস সালাম সাহেবের পদমর্যাদা ক্ষুন্ন হচ্ছে না তাদের নিজেদের ?

ডঃ আব্দুস সালাম সাহেব লন্ডনে ইমপিরিয়াল কলেজ অফ সায়েন্স্ এ্যান্ড টেকনোলজিতে ফিজিক্সের অধ্যাপক। পাকিস্তান তাকে অবজ্ঞা করছে। কিন্তু তিনি শুধু পাকিস্তানে নয় বরং পুরো এশিয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত। তার নিজের ধারণা ভারত ও পাকিস্তানের মেধা ইউরোপের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। আমাদের নিজেদের হীনমন্নতা ও বঞ্চনার অনুভূতি দূরীভূত করতে হবে। পরিশ্রমের দ্বারা নিজেদের লক্ষ্যস্থল নির্ণয় করতে হবে। যদি এইরূপ করতে পারি, তাহলে আমাদের উভয় দেশে উচ্চ বুদ্ধিজীবির স্বল্পতা থাকবেনা।

ইউরোপীয় দেশগুলিতে অস্ত্রসজ্জা ও মানবজাতির ক্ষতিসাধনের যে সমস্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য কোটি কোটি-টাকা খরচ হচ্ছে বা ভিন গ্রহে প্রাণের সন্ধানে অজস্র ধন-সম্পদ ব্যয় হচ্ছে, এর জন্য তিনি তার ঘোর বিরোধী। তার ধারণা আজ আমাদের ভিন গ্রহের সাথে দৃঢ়ভাবে সম্পর্ক স্থাপন করার কী প্রয়োজন। আমরা যখন নিজেরা মানব ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করতে পারিনি! আজকের মানুষ অন্নের মুখাপেক্ষি। এই সমস্যা অধিক গুরুত্বপূর্ণ না ভিন গ্রহে প্রাণের সন্ধান ? ডঃ আব্দুস সালামের এই কথাগুলি কিছুটা পাকিস্তানের উপর সত্য প্রতিপন্ন হয়, যারা নিজেদের দেশে একজন উচ্চ বুদ্ধিজীবির থেকে নিজেদের বঞ্চিত রেখেছে।

ডঃ আব্দুস সালাম সাহেব তৃতীয় বিশ্বের (এক পরিভাষায় উন্নয়নশীল) দেশের বাসিন্দা হয়েও পরিশ্রম, যোগ্যতা ও উদ্দীপনার ভিত্তিতে বিশেষতঃ ভারতের মুসলমানদের নিকট একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যারা কুসংস্কারের বিষ পান করে একদিকে বিষাক্ত হয় এবং ক্রমান্বয়ে সঙ্কীর্ণতার শিকার হয়ে পড়েছে, যার ফলে তারা শিক্ষাক্ষেত্রে তো দূরে ছিলই বরং আরও দূরে চলে যাচ্ছে।

ডঃ আব্দুস সালাম সাহেব প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, কুসংস্কার ও বৈমাত্রীসুলভ ব্যবহার থাকা সত্ত্বেও মেধাবী ও অধ্যাবসায়শীল ছাত্র স্বীয় মর্যাদা ও স্থান প্রতিষ্ঠালাভ করতে সক্ষম। যার জন্য কোন নির্ভরতা, দয়া-দাক্ষিণ্য ও সুযোগ-সুবিধার প্রয়োজন নেই।

(ইনকিলাব, বোম্বাই, ২২ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১)

****

১ম পাতার পর...

স্বীকার করে। প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীরা নিজ নিজ ধর্মের নবীদের সত্যতার স্বীকারুক্তি আদায় করে ঠিকই, কিন্তু অপরাপর জাতিসমূহে আগত নবীদের সত্যতার স্বীকারুক্তি আদায়ের প্রতি কোনও মনোযোগ নেই। ইসলাম ধর্ম সমস্ত নবীর সত্যতার স্বীকারুক্তি দেয়- বানী ইসরাঈল জাতিতে আবির্ভূত নবী হোক বা হিন্দুস্তান ও ইরানের মানুষদের মাঝে আবির্ভূত নবী হোক বা পৃথিবীর অন্য কোনও জাতিতে বা দেশে সংশোধনের জন্য আবির্ভূত হোক। কিন্তু এক্ষেত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ঈমান আনার কথা বলা হয় নি, বরং সামগ্রিকভাবে ঈমান আনার কথা বলা হয়েছে। যদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ঈমান আনা বোঝানো হত, তবে وَمَا أُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ আয়াতে সেই সকল নবীদের উল্লেখ করা হত না, আমরা যাঁদের নামও জানি না আর কুরআন করীমও যাঁদের জীবন বৃত্তান্ত কোথাও বর্ণনা করেনি। তবুও সামগ্রিকভাবে তাঁদের উপর ঈমান আনা আবশ্যক করা হয়েছে।

এখানে আমি মুসলমানদেরকেও এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, খোদা তা'লা বলেছেন, যে ব্যক্তি সমস্ত নবীকে মানে, সেই মুসলমান। অপরদিকে আঁ হযরত (সা.) আগমণকারী মসীহকে নবী নামে অভিহিত করেছেন। আর এই যুগে প্রতিশ্রুত মসীহর প্রতিশ্রুতি জামাত আহমদীয়ার প্রবর্তক-এর সত্তায় পূর্ণ হয়েছে। অতএব প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে ইসলামের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তার কর্তব্য হল সতর্ক হয়ে যাওয়া এবং তাঁর দাবি বিচার করার বিষয়ে অবহেলা না করা। কেননা, অবহেলায় ইসলামের ন্যায় মূল্যবান বস্তু হারানোর আশঙ্কা রয়েছে। মুসলিম সেই ব্যক্তিই যে খোদা তা'লা সমস্ত নবীকে মান্য করে, আর এক্ষেত্রে প্রতিশ্রুত মসীহর নবুয়তও ব্যতিক্রমী নয়। কাজেই মুসলমানদের জন্য সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

(তফসীরে কবীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ২১০-২১১)

আমাদের ধর্ম-বিশ্বাস

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ান (আ.) বলেন-

" আমরা মুসলমান। এক-অদ্বিতীয় খোদা তা'লার প্রতি ঈমান রাখি এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ কলেমায় আমরা বিশ্বাসী। আমরা কুরআনকে খোদার কিতাব এবং তাঁর রসূল খাতামাল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে মানি। আমরা ফিরিশতা, কিয়ামত অর্থাৎ পুনরুত্থান দিবস, জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাসী। আমরা নামায পড়ি ও রোযা রাখি এবং কিবলামুখী হই। যা কিছু আল্লাহ্ ও রসুল (সা) 'হারাম' তথা নিষিদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন সেগুলোকে হারাম জ্ঞান করি এবং যা কিছু 'হালাল' তথা বৈধ করেছেন সেগুলোকে হালাল আখ্যা দিই। আমরা শরীয়তে কোন কিছু সংযোজনও করি না, বিয়োজনও করি না, এবং এক বিন্দু পরিমাণও কম-বেশী করি না। যা কিছু রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাধ্যমে আমরা পেয়েছি-আমরা এর হিকমত বুঝি না বুঝি কিংবা এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব নাইবা উদ্ধার করতে পারি- আমরা তা গ্রহণ করি। আমরা আল্লাহ্‌র ফযলে বিশ্বাসী, একত্ববাদী মুসলমান।" (নুরুল হক' খণ্ড-১, পৃ: ৫)

জুমআর খুতবা

রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, 'তালহা এবং যুবায়ের জান্নাতে আমার প্রতিবেশী হবে।"

হযরত যুবায়ের (রা.) দ্বীনের স্তম্ভগুলির মধ্যে একটি। [হযরত উমর (রা.)]

ওহীর লিপিকার, আঁ হযরত (সা.)-এর শিষ্য মহা মর্যাদাবান বদরী সাহাবী হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.) এর প্রশংসনীয় গুণাবলীর উল্লেখ।

তিন জন মরহুমের প্রশংসাসূচক গুণাবলীর উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব। তারা হলেন, মাননীয় আল হাজা ইব্রহিম মুবায়ে সাহেব (নায়েব আমীর, গাম্বিয়া), মাননীয় নঈম আমহদ খান (নায়েব আমীর করাচি) এবং আরওলী মহম্মদ সাহেবের স্ত্রী মাননীয়া বুশরা বেগম সাহেবা।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, থেকে প্রদত্ত ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২০, এর জুমুআর খুতবা (৪ তাবুক, ১৩৯৯ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন:

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۛ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ

যারা নিজেরা আহত হবার পরও আল্লাহ্ ও রসূলের নির্দেশ মান্য করে, তাদের মধ্য থেকে যারা নিজেদের কর্তব্য সুচারুরূপে পালন করেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য রয়েছে মহা প্রতিদান।

(সূরা আলে ইমরান: ১৭৩)

সাহাবীদের স্মৃতিচারণ হচ্ছিল আর হযরত যুবায়ের (রা.)-এর স্মৃতিচারণ কিছুটা বাকি ছিল, আজ সেই অবশিষ্টাংশ বর্ণনা করব। আমি এখনই যে আয়াত পাঠ করেছি সে আয়াত সম্পর্কে বলতে গিয়ে হযরত আয়েশা (রা.) তার ভাগ্নে উরওয়াকে বলেন, হে আমার ভাগ্নে! তোমার পিতৃপুরুষ হযরত যুবায়ের ও হযরত আবু বকর এই আয়াতে উল্লিখিত সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। উহুদের যুদ্ধে মহানবী (সা.) যখন আহত হন এবং মুশরিকরা পশ্চাদপসরণ করে তখন তিনি (সা.) আশঙ্কা অনুভব করেন যে, তারা পুনরায় ফিরে এসে হামলা না করে বসে। এজন্য তিনি (সা.) বলেন, তাদের পিছু ধাওয়া করতে কে কে যাবে? তাৎক্ষণিকভাবে তাদের মধ্য থেকে সত্তর জন সাহাবী প্রস্তুত হয়ে যান।বর্ণনকারী বলেন, হযরত আবু বকর ও হযরত যুবায়ের (রা.)-ও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এটি সহীহ্ বুখারীর রেওয়ায়েত। হযরত আবু বকর ও হযরত যুবায়ের (রা.) উভয়ই আহতদেরও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। (সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪০৭৭)

সহীহ্ মুসলিমে এ ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হিশাম তার পিতার কাছ থেকে শুনে বর্ণনা করেন, হযরত আয়েশা (রা.) আমাকে বলেছেন যে, তোমাদের পিতৃপুরুষ সেসব সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত যারা আহত হবার পরও আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ডাকে লাব্বায়েক বলেছে (তথা তৎক্ষণাৎ সাড়া দিয়েছে)।

(সহী মুসলিম, কিতাবু ফাযায়েলুস সাহাবা, হাদীস-২৪১৮)

হযরত আলী বর্ণনা করেন, আমি নিজ কানে মহানবী (সা.)-কে একথা বলতে শুনেছি যে, তালহা ও যুবায়ের জান্নাতে আমার প্রতিবেশী হবেন।

(সুনান তিরমিযি, আবওয়াবুল মানাকিবু, হাদীস-৩৭৪০)

হযরত সাঈদ বিন যুবায়ের বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত তালহা, হযরত যুবায়ের, হযরত সা'দ, হযরত আব্দুর রহমান এবং হযরত সাঈদ বিন যায়েদ রিযওয়ানুল্লাহি আলাইহিম- এর যে পদমর্যাদা ছিল তা হলো, তারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর সম্মুখভাগে যুদ্ধ করতেন আর নামাযে তাঁর (সা.) পিছনে দাঁড়াতেন।

(উসদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৭৮)

হযরত আব্দুর রহমান বিন আখনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি মসজিদে ছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি হযরত আলী (রা.)-এর উল্লেখ করে এবং তাঁর সম্পর্কে কিছু অসম্মানজনক কথা বলে, তখন হযরত সাঈদ বিন যায়েদ (রা.) দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর সাক্ষ্য দিয়ে বলছি যে, আমি এটি নিঃসন্দেহে তাঁর (সা.) কাছ থেকে শুনেছি, তিনি বলতেন, দশজন ব্যক্তি জান্নাতে যাবে। মহানবী (সা.) জান্নাতে থাকবেন, হযরত আবু বকর জান্নাতে থাকবেন, হযরত উমর জান্নাতে থাকবেন, হযরত উসমান জান্নাতে থাকবেন, হযরত আলী জান্নাতে থাকবেন, হযরত তালহা, হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম, হযরত সা'দ বিন মালেক এবং হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ রিযওয়ানুল্লাহি আলাইহিম জান্নাতে থাকবেন। আর আমি চাইলে দশম ব্যক্তির নামও বলতে পারি। বর্ণনাকারী বলেন, লোকেরা জিজ্ঞেস করে দশম ব্যক্তি কে? হযরত সাঈদ বিন যায়েদ কিছুক্ষণ নীরব থাকেন। বর্ণনাকারী বলেন, কতিপয় লোক পুনরায় জিজ্ঞেস করে যে, দশম ব্যক্তি কে? তিনি বলেন, সাঈদ বিন যায়েদ, অর্থাৎ তিনি নিজেই।

(সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, হাদীস-৪৬৪৯)

হযরত তালহা (রা.)-এর স্মৃতিচারণেও সম্ভবত এই রেওয়ায়েতটি বর্ণিত হয়েছে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) ওহী লেখকগণের নাম বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, মহানবী (সা.)-এর প্রতি যে ওহী অবতীর্ণ হতো, তা তৎক্ষণাৎ লিপিবদ্ধ করা হতো। অতএব মহানবী (সা.) যেসব লেখককে দিয়ে পবিত্র কুরআন লিপিবদ্ধ করাতেন তাদের মাঝে নিম্নলিখিত পনেরো জনের নাম ঐতিহাসিকভাবে সাব্যস্ত।

যায়েদ বিন সাবেত, উবাই বিন কা'ব, আব্দুল্লাহ্ বিন সা'দ বিন আবি সারাহ্, যুবায়ের বিন আওয়াম, খালেদ বিন সাঈদ বিন আস, হিব্বান বিন সাঈদুল আস, হানযালাহ্ বিন রবি'উল আসাদী, মুইকিব বিন আবি ফাতেমা, আব্দুল্লাহ্ বিন আরকাম আয্ যুহরী, শুরাহ্বিল বিন হাসানা, আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা, হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান, হযরত আলী রিযওয়ানুল্লাহি আলাইহিম। মহানবী (সা.)-এর প্রতি যখন পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হতো, তখন তিনি (সা.) তাদের মধ্য থেকে কাউকে ডেকে ওহী লিপিবদ্ধ করাতেন।

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৪২৫-৪২৬)

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) হযরত যুবায়ের বিন আওয়ামকে এক যুদ্ধাভিযানে চুলকানির কারণে রেশমী জামা পরিধানের অনুমতি প্রদান করেছিলেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সীর, হাদীস-২৯১৯)

মহানবী (সা.) যখন মদিনায় বাড়ি-ঘরের সীমানা নির্ধারণ করছিলেন, তখন হযরত যুবায়েরের জন্য জমির একটি বড় অংশ বরাদ্দ করেন। তিনি (সা.) হযরত যুবায়েরকে একটি খেজুরের বাগানও দিয়েছিলেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৭৬)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) যুবায়ের বিন আওয়ামকে মহানবী

(সা.) এর জমি হেবা করা সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

মহানবী (সা.) হযরত যুবায়েরকে সরকারী জমি থেকে একটি এত বড় ভূমিখণ্ড প্রদান করেন যাতে হযরত যুবায়েরের ঘোড়া দম শেষ হওয়া পর্যন্ত দৌড়াতে পারত, অর্থাৎ সেটির পক্ষে যতটুকু দৌড়ানো সম্ভব ছিল সে পর্যন্ত । হযরত যুবায়েরের ঘোড়া যেখানে গিয়ে থামে, সেখান থেকে তিনি নিজের চাবুক খুব জোরে উপরে নিক্ষেপ করেন এবং মহানবী (সা.) সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে, তাঁকে কেবল ঐ সীমা পর্যন্ত জমি-ই প্রদান করা হবে না, যেখানে তার ঘোড়া গিয়ে দাঁড়িয়েছে, বরং যেখানে তার চাবুক পড়েছে, সে স্থান পর্যন্ত তাকে ভূমিখণ্ড প্রদান করা হোক। তিনি (রা.) লিখেন, আমাদের দেশের ঘোড়াও কয়েক মাইল দৌড়াতে পারে, আর আরবের ঘোড়া তো খুবই দ্রুতগামী হয়ে থাকে। উক্ত ঘোড়া যদি চার-পাঁচ মাইলও দৌড়াতে পারে বলে ধরা হয়, তাহলে উক্ত জমির ব্যাপ্তি হয় প্রায় বিশ হাজার একর, যা তাকে প্রদান করা হয়েছিল।

ইমাম আবু ইউসুফ তার কিতাবুল খিরাজ পুস্তকে লিখেন, মহানবী (সা.) হযরত যুবায়েরকে একটি ভূমিখণ্ড প্রদান করেন যেখানে খেজুরের বাগানও ছিল আর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)ও ইমাম আবু ইউসুফের বরাতে একই বিষয় বর্ণনা করেছেন। তিনি (রা.) বলেন, তাকে যে ভূমিখণ্ড প্রদান করা হয়েছিল, সেখানে খেজুরের বাগানও ছিল আর সেটি কোন এক সময় ইহুদি গোত্র বনু নযিরের মালিকানাধীন ছিল। সেটিকে জুরফ বলা হতো [জুরফ সিরিয়ার রাস্তায় মদিনা থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত একটি জায়গার নাম] অর্থাৎ তা একটি স্থায়ী গ্রাম ছিল। পূর্বোক্ত হাদীসগুলোর সাথে এই হাদীসকে যদি আমরা মিলিয়ে দেখি তাহলে এটি থেকে এই ফলাফলই বের হয় যে, মহানবী (সা.) হযরত যুবায়েরকে উক্ত বিশ হাজার একর ভূমি প্রদান করেছিলেন অথচ তিনি পূর্ব থেকেই, একটি গ্রামের মালিক ছিলেন, যাতে খেজুরের বাগানও ছিল।

(আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২১, পৃ: ৪২৯)

উরওয়া বিন যুবায়ের (রা.) থেকে বর্ণিত, মারওয়ান বিন হাকাম বলেন, যে বছর নক্সীর বা নাক দিয়ে রক্ত পড়ার রোগ ছড়িয়ে পড়ে, তখন হযরত উসমান বিন আফফান উক্ত রোগে কঠিনভাবে আক্রান্ত হন। এমনকি তা তাকে হজ্জ করা থেকে বিরত রাখে আর তিনি ওসীয়্যতও করেন। তখন কুরাইশদের কোন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলে, কাউকে খলীফা মনোনীত করে দিন; অর্থাৎ অবস্থা খুবই শোচনীয়। তিনি জিজ্ঞেস করেন, মানুষ কি একথা বলাবলি করছে? সেই ব্যক্তি উত্তরে বলে, হ্যাঁ। তখন হযরত উসমান (রা.) জিজ্ঞেস করেন, তারা কাকে খলীফা বানাতে চায়? সে ব্যক্তি চুপ থাকে। এরই মাঝে আরেক ব্যক্তি তাঁর কাছে আসে। বর্ণনাকরী বলেন, আমার মনে হয় সে হারেস ছিল। সে বলে, কাউকে খলীফা মনোনীত করে দিন। হযরত উসমান (রা.) বলেন, একথা কি লোকেরা বলছে? সে উত্তরে বলে, হ্যাঁ, অর্থাৎ তাঁর পর কে খলীফা হবেন (তা নির্ধারণ করতে বলা হচ্ছে)। হযরত উসমান (রা.) জিজ্ঞেস করেন, কে খলীফা হবেন? সে চুপ থাকে। হযরত উসমান (রা.) তাকে বলেন, তারা সম্ভবত যুবায়ের (রা.)-কে মনোনীত করতে বলছে। সে বলে, হ্যাঁ। তখন হযরত উসমান (রা.) বলেন, সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমার জ্ঞানে তিনি অর্থাৎ হযরত যুবায়ের (রা.) ঐ সকল লোকের মাঝে নিশ্চিতভাবে উত্তম এবং তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছেও সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন।

হযরত যুবায়ের (রা.) বলতেন, একবার তাঁর সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এক আনসারী সাহাবীর মহানবী (সা.)-এর উপস্থিতিতে পানির নালা সম্পর্কে মতভেদ হয় যদ্বারা তারা উভয়ে তাদের ক্ষেতে সেচ দিতেন। মহানবী (সা.) বিষয়টি মীমাংসার উদ্দেশ্যে বলেন, হে যুবায়ের! তোমার ক্ষেতে সেচ দেওয়ার পর তুমি তোমার প্রতিবেশীর জন্য পানি ছেড়ে দিও। কিন্তু আনসারীর কাছে এ কথাটি মনঃপূত হয় নি। তাই সে বলে, হে আল্লাহ্ র রসূল (সা.)! সে আপনার ফুপাত ভাই, তাই আপনি এমন সিদ্ধান্ত দিলেন, তাই না? একথা শুনে মহানবী (সা.) -এর পবিত্র চেহারার রং পাল্টে যায় আর তিনি (সা.) যুবায়ের (রা.)-কে সম্বোধন করে বলেন, এখন তুমি তোমার ক্ষেতে সেচ দিতে থাক আর পানি আল পর্যন্ত না পৌঁছা পর্যন্ত তুমি পানি আটকে রাখ। এভাবে মহানবী (সা.) হযরত যুবায়ের (রা.)-কে তার পুরো অধিকার পাইয়ে দেন। অথচ ইতিপূর্বে তিনি (সা.) হযরত যুবায়ের (রা.)-কে এমন পরামর্শ দিয়েছিলেন যাতে তার ও আনসারীর জন্য স্বাচ্ছন্দ্য ও সুযোগ সুবিধা ছিল। কিন্তু আনসারী যখন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ করেন, তখন মহানবী (সা.) সঠিক নির্দেশ প্রদানের মাধ্যমে হযরত যুবায়ের (রা.)-কে তার পুরো অধিকার পাইয়ে দেন। হযরত যুবায়ের (রা.) বলেন, খোদার কসম! আমি মনে করি নিম্নলিখিত আয়াতটি এ ঘটনা সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে।

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيٓ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

অর্থাৎ, অসম্ভব! তোমার প্রভুর কসম! তারা কখনোই ঈমান আনতে পারে না যতক্ষণ না তারা তোমাকে সেসব বিষয়ে বিচারক মানবে যেগুলোতে তাদের মাঝে বিবাদ হয়েছে। অতঃপর তুমি যে সিদ্ধান্তই প্রদান কর, সে বিষয়ে তারা যেন নিজ হৃদয়ে কোন প্রকার সংকীর্ণতা অনুভব না করে এবং পরিপূর্ণ আনুগত্য করে। (সূরা নিসা: ৬৬)

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বাল, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৫৩)

হযরত যুবায়ের (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, যখন আয়াত ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ (সূরা যুমার: ৩২) অর্থাৎ, অবশ্যই তোমরা কিয়ামতের দিন তোমাদের প্রভু প্রতিপালকের সমীপে একে অপরের সাথে বিতর্ক করবে- অবতীর্ণ হয়, তখন তারা নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্ র রসূল (সা.)! এর দ্বারা কি আমাদের জাগতিক ঝগড়া বিবাদ বুঝাচ্ছে? মহানবী (সা.)বলেন, হ্যাঁ এরপর যখন আয়াত ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (সূরা তাকাসুর: ০৯) অর্থাৎ সেদিন তোমরা অবশ্যই নেয়ামত ও প্রাচুর্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে- অবতীর্ণ হয় তখন হযরত যুবায়ের (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমরা কোন প্রাচুর্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হব? আমাদের কাছে যে কেবল খেজুর আর পানি রয়েছে। মহানবী (সা.) বলেন, সাবধান! সেই প্রাচুর্যের যুগও অচিরেই আসতে যাচ্ছে।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বাল, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৪৯)

এখন কষ্ট ও কাঠিন্যের যুগ চলছে, (এরপর) ইনশাআল্লাহ্ স্বাচ্ছন্দ্যের যুগও আসতে যাচ্ছে। হাব্স বিন খালেদ বলেন, আমার কাছে সেই বুযুর্গ এই হাদীস বর্ণনা করেন যিনি মসুল থেকে আমাদের কাছে আসতেন। মসুল সিরিয়ার একটি বিখ্যাত শহর, যা বিপুল জনবসতি ও বিশাল আয়তনের দিক থেকে তৎকালে ইসলামী দেশ সমূহের মাঝে বিশেষ গুরুত্ব রাখতো; সকল শহর থেকে সেখানে লোকজন আসতো। এটি নিনেভার নিকটে দজলা নদীর তীরে ও বাগদাদ থেকে ২২২ মাইল দূরে অবস্থিত। অভিধানে এই শহরের পরিচয় এটাই লেখা হয়েছে। যাহোক, তিনি বর্ণনা করেন, মসুল থেকে সেই বুযুর্গ আমাদের কাছে আসতেন। তিনি বলেন, আমি হযরত যুবায়ের বিন আওয়ামের সাথে কতিপয় সফর করেছি। একবারের ঘটনা, কোন এক মরুভূমিতে তার গোসলের প্রয়োজন হয়; তিনি আমাকে বলেন, আমার জন্য পর্দার ব্যবস্থা কর। আমি তার জন্য কাপড় দিয়ে পর্দার ব্যবস্থা করি। তিনি গোসল আরম্ভ করেন। হঠাৎ তার দেহের ওপর আমার দৃষ্টি পড়ে। আমি দেখলাম, তার সারা দেহ তরবারির আঘাতের চিহ্নে পূর্ণ ছিল। আমি তাকে বললাম, খোদার কসম, আপনার শরীরে আঘাতের এমন চিহ্ন আমি দেখেছি যা আজকের পূর্বে কখনো কারো শরীরে দেখি নি! তিনি প্রত্যুত্তরে বলেন, তুমি কি আমার শরীরে আঘাতের চিহ্নগুলো দেখে ফেলেছ? তারপর বলেন, খোদার কসম! সবকটি আঘাত আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সহযোদ্ধা হয়ে আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করার সময় পেয়েছি।

(মুসতাদরিক আলাস সালেহীন লিল হাকিম, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪০৬)

হযরত উসমান, হযরত মিক্ব দাদ, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ ও হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ হযরত যুবায়েরকে ওসীয়্যত করে রেখেছিলেন, এজন্য তিনি তাদের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করতেন এবং নিজ সম্পদ থেকে তাদের সন্তানদের ব্যয় নির্বাহ করতেন। যেহেতু তিনি স্বচ্ছল ছিলেন, তাই তাদের সন্তানদের জন্য তাদের সম্পদ খরচ করতেন না, বরং নিজের পক্ষ থেকে খরচ করতেন, যেন সেই সম্পদ পরবর্তীতে তাদের কাজে লাগে; তার কোনরকম লোভলিপ্সা ছিল না।

নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

এই টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।

টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131

সময়: প্রত্যহ সকাল ৮:৩০টা থেকে রাত ১০:৩০ পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)

হযরত যুবায়ের সম্পর্কে জানা যায় যে ,তার এক হাজার দাস ছিল, যারা তাকে ভূমিজ উৎপাদনের কর প্রদান করত; এগুলোর কিছুই তিনি বাড়িতে আনতেন না, পুরোটাই সদকা করে দিতেন।

মুতী বিন আসওয়াদ বর্ণনা করেন, আমি হযরত উমরকে একথা বলতে শুনেছি যে, হযরত যুবায়ের ধর্মের স্তম্ভগুলোর মধ্যকার একটি স্তম্ভ। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের বর্ণনা করেন যে, হযরত যুবায়ের যখন উষ্ট্রীর যুদ্ধের দিন দণ্ডায়মান হন, তখন তিনি আমাকে ডাকেন। আমি তার কাছে গিয়ে দাঁড়াই। তিনি বলেন, হে প্রিয় পুত্র! আজকে হয় অত্যাচারী ব্যক্তি নিহত হবে, নতুবা অত্যাচারিত ব্যক্তি। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে, আজ আমি নিপীড়িত অবস্থায় নিহত হব। আমার সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা হলো নিজের ঋণ নিয়ে। তোমার কি মনে হয় আমার ঋণ পরিশোধ করার পরও কিছু সম্পদ অবশিষ্ট থাকবে? এরপর বলেন, হে আমার পুত্র! সম্পদ বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করে দিও; আর আমি এক-তৃতীয়াংশ ওসীয়্যত করছি। ঋণ পরিশোধের পর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে তাথেকে এক-তৃতীয়াংশ তোমার সন্তানদের জন্য। অর্থাৎ অন্যদের পাশাপাশি তার সন্তানদেরও তিনি দান করেন। হিশাম বলেন, আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়েরের ছেলেরা বয়সে হযরত যুবায়েরের ছেলে খুবায়েব ও আব্বাদের সমান ছিলেন। অর্থাৎ আব্দুল্লাহ্র ছেলেরা বয়সে হযরত যুবায়েরের নিজের ছেলেদের সমান ছিলেন। অর্থাৎ ছেলের পুত্র যারা ছিল, তারাও তার (অর্থাৎ ছেলের) ভাইদের সমবয়স্ক ছিল। সেসময় হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়েরের নয়জন কন্যা ছিল। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের বর্ণনা করেন, হযরত যুবায়ের আমাকে তার ঋণ সম্পর্কে ওসীয়্যত করেন যে, হে আমার পুত্র, যদি এই ঋণের কোন অংশ পরিশোধ করতে তুমি অপারগ হও, তবে আমার মওলার সাহায্য নিও। আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের বলেন, মওলা বলতে তিনি কী বোঝাতে চেয়েছিলেন- তা আমি বুঝতে পারি নি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার মওলা কে? এতে হযরত যুবায়ের বলেন, 'আল্লাহ্'। পরবর্তীতে যখনই আমি তার ঋণ নিয়ে কোন সমস্যায় পড়েছি, তখন এ দোয়া করেছি যে, হে যুবায়ের-এর মওলা! তুমি তার ঋণ পরিশোধ করে দাও এবং তিনি তা পরিশোধ করে দিতেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা সেই ঋণ পরিশোধের কোন না কোন ব্যবস্থা কিংবা উপকরণ সৃষ্টি করে দিতেন। তার যেহেতু সম্পদ ছিল তাই তা থেকে ঋণ পরিশোধ হয়ে যেত।

হযরত যুবায়ের (রা.) এমন অবস্থায় শাহাদাত বরণ করেন যখন তার নিকট কোন দিনার বা দিরহাম ছিল না, কিছু জমি ব্যতিরেকে যার মাঝে গাবাও ছিল। মদিনায় তার ১১টি বাড়ি ছিল। এছাড়া বসরাতে ২টি, কুফায় ১টি এবং মিশরে ১টি বাড়ি ছিল। হযরত যুবায়ের (রা.) যেভাবে ঋণগ্রস্ত হন তা হলো, মানুষ তার কাছে বিভিন্ন ধনসম্পদ আমানতস্বরূপ রাখতে আসতো, কিন্তু তিনি (রা.) বলতেন, এগুলো আমানত নয় বরং ঋণ হিসেবে রাখব, কেননা আমি তা নষ্ট হবার আশঙ্কা করি। আমি এগুলো আমানত হিসেবে রাখব না বরং ঋণ যেরূপ হয়ে থাকে আমি তোমার কাছ থেকে এগুলো সেভাবেই গ্রহণ করছি। তিনি তা থেকে খরচও করতেন। আর কোন ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে সেটি থেকেও যেন তা সুরক্ষিত হয়ে যায় একারণে তিনি তাদের বলতেন, আমি এগুলো ঋণস্বরূপ গ্রহণ করছি যা আমি পরিশোধ করব। যাহোক, ঋণ পরিশোধ করার কারণে হোক বা রাজস্বের জন্য হোক অথবা অন্য কোন আর্থিক সেবার জন্যই হোক, হযরত যুবায়ের (রা.) কখনো সম্পদশালী হন নি। তবে তিনি (রা.) সর্বদা মহানবী (সা.), হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.) এবং হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি (রা.) জিহাদে অবশ্যই অংশ নিতেন, কিন্তু তিনি প্রচুর ধনী মানুষের ন্যায় নগদ অর্থ জমাতে পারেন নি।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের (রা.) বর্ণনা করেন, আমি একবার তার ঋণের হিসাব করলাম যা ২২ লক্ষ ছিল। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের (রা.)-এর সাথে হযরত হাকীম বিন হিযাম (রা.) সাক্ষাৎ করে বলেন, হে আমার ভাতিজা! আমার ভাইয়ের কী পরিমাণ ঋণ রয়েছে? তখন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের (রা.) তা গোপন করেন এবং বলেন, ১ লাখ। এটি শুনে হযরত হাকীম বিন হিযাম (রা.) বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি তোমার নিকট এই ঋণ পরিশোধ করার মতো যথেষ্ট সম্পদ দেখতে পাই না অর্থাৎ বাহ্যত যে সম্পদ দৃষ্টিপটে ছিল তার কথা বলেন। অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের (রা.) তাকে বলেন, আর আমি যদি বলি, সেই ঋণ ২২ লাখ তাহলে আপনি কী বলবেন? এর উত্তরে তিনি (রা.) বলেন, আমি তোমাকে তা পরিশোধ করার মতো সামর্থবান মনে করি না, তা পরিশোধ করা তোমার জন্য কঠিন। তুমি যদি সে ঋণ পরিশোধ করতে না পার, তবে আমার সাহায্য নিও। ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে আমি আছি। তুমি আমাকে বলবে আর আমি তা পরিশোধ করে দিব। হযরত যুবায়ের (রা.) গাবা (ভূখণ্ডটি) ১ লক্ষ ৭০ হাজার দিয়ে ক্রয় করেছিলেন। আর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের (রা.) সেই জমি ১৬ লাখে বিক্রি করেন। তারপর দাঁড়িয়ে ঘোষণা দেন, হযরত যুবায়ের (রা.)-এর কাছে যার পাওনা আছে সে যেন আমাদের কাছে গাবায় চলে আসে। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের (রা.) গাবার সেই জমি বিক্রয় করে ১৬ লাখ মূল্য পান এবং তারপর ঘোষণা দেন যে, যারা ঋণদাতা রয়েছে তারা নিজ নিজ ঋণ বুঝে নিন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাফর, যার হযরত যুবায়েরের কাছে ৪ লাখ পাওনা ছিল, তিনি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের (রা.)-কে বলেন, তোমরা চাইলে আমি এটি মাফ করে দিতে পারি অথবা চাইলে যেসব ঋণ তোমরা পরে দিবে বলে মনস্থ করেছ তার মাঝে এটিকেও অন্তর্ভুক্ত করতে পার, অবশ্য যদি বিলম্বিত করার মনস্থ করে থাক। কিন্তু হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের (রা.) বলেন যে, না। তখন তিনি (রা.) বলেন, তাহলে আমাকে এক খণ্ড জমি দাও। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের (রা.) বলেন, ঠিক আছে, এখান থেকে ওখান পর্যন্ত তোমার জমি। অর্থাৎ তিনি তা থেকে ঋণ পরিশোধ খাতে কিছু জমি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাফর (রা.)-কে দিয়ে দেন। এই ঋণের মধ্যে সাড়ে চার ভাগ অবশিষ্ট থাকে। তারপর হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের (রা.) হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর নিকট আসেন। সেখানে হযরত আমর বিন উসমান (রা.), হযরত মুনযের বিন যুবায়ের (রা.) এবং হযরত ইবনে যমআ (রা.) বসেছিলেন। হযরত মুআবিয়া (রা.) জিজ্ঞেস করেন, গাবার মূল্য কত ধরা হয়েছে? উত্তরে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের (রা.) বলেন, প্রতি অংশ ১ লক্ষ নির্ধারণ করা হয়েছে। হযরত মুআবিয়া (রা.) বলেন, কতঅংশ অবশিষ্ট আছে? তিনি (রা.) বলেন, সাড়ে চার অংশ। তখন হযরত মুনযির বিন যুবায়ের (রা.) বলেন, আমি ১ লক্ষের বিনিময়ে একটি অংশ নিচ্ছি। অতঃপর হযরত আমর বিন উসমান (রা.) বলেন, আমি ১ লক্ষ দিয়ে একটি অংশ নিয়ে নিলাম। এরপর হযরত ইবনে যমআ (রা.) বলেন, আমিও ১ লক্ষ দিয়ে একটি অংশ নিয়ে নিলাম। অতঃপর হযরত মুআবিয়া (রা.) বলেন, আর কতটুকু রইল? হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের (রা.) বলেন, দেড় অংশ। তখন তিনি (রা.) বলেন, আমি দেড় লাখ দিয়ে তা নিয়ে নিলাম। অর্থাৎ অবশিষ্ট জমিটুকুও এভাবে বিক্রি করতে থাকেন। আব্দুল্লাহ্ বিন জাফর তার অংশ হযরত মুয়াবিয়ার কাছে ছয় লাখে বিক্রি করে দেন। যাহোক, তিনি যে বলেছিলেন আল্লাহ্ তা'লা ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করবেন, তো এভাবে আল্লাহ্ তা'লা উপকরণ সৃষ্টি করেন। তিনি তার কিছু কিছু সম্পদ বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করতে থাকেন।

যখন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের হযরত যুবায়েরের পুরো ঋণ পরিশোধ করা শেষ করেন তখন হযরত যুবায়েরের সন্তানরা বলে, ঋণ যা ছিল তার সব পরিশোধ হয়ে গেছে, তাই আমাদের মধ্যে আমাদের পৈত্রিক সম্পত্তি বণ্টন করে দিন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের বলেন, না; খোদার কসম! আমি চার বছর পর্যন্ত হজ্জের মৌসুমে ঘোষণা না করা পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টন করব না। অর্থাৎ প্রথমে চার বছর পর্যন্ত প্রত্যেক হজ্জের দিন ঘোষণা করব যে, যুবায়েরের কাছে যার কোন পাওনা আছে সে যেন আমাদের কাছে আসে, আমরা তা পরিশোধ করব। এরপর চার বছর পর্যন্ত তিনি হজ্জের সময় এ ঘোষণা করতে থাকেন। চার বছর অতিক্রান্ত হবার পর তিনি হযরত যুবায়েরের সন্তানদের মধ্যে উত্তরাধিকার বণ্টন করে দেন।

হযরত যুবায়েরের চারজন স্ত্রী ছিলেন। তিনি স্ত্রীর প্রাপ্য এক অষ্টমাংশ চার স্ত্রীর মধ্যে ভাগ করে দেন আর প্রত্যেক স্ত্রী এগার লক্ষ করে পান। অর্থাৎ অন্যদের অংশ পরিশোধের পর অবশিষ্ট যে সম্পত্তি ছিল সেটি ভাগ করলে স্ত্রীরাও এগারো লক্ষ করে পান। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, তার সাকুল্য সম্পদ ছিল তিন কোটি বাহান্ন লক্ষ মূল্যমানের।

যুগ খলীফার বাণী

" প্রত্যেক আহমদীর নিজের পাঁচ ওয়াক্তের নামায নিয়মিত পড়ার প্রতি এবং বা-জামাত নামায পড়ার প্রতি মনোযোগ আছে কি না তা পর্যালোচনা করে দেখা উচিত।"

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ১১ অক্টোবর, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdur Rehman Khan, Manager Lilly Hotel (Gwahati)

সুফিয়ান বিন উয়ায়নাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত যুবায়েরের রেখে যাওয়া সম্পত্তির পরিমাণ ছিল চার কোটি, যা বণ্টন করা হয়েছে। হিশাম বিন উরওয়া তার পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত যুবায়ের-এর ছেড়ে যাওয়া সম্পত্তির মূল্যমান ছিল পাঁচ কোটি বিশ লক্ষ বা পাঁচ কোটি দশ লক্ষ। অনুরূপভাবে উরওয়া থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত যুবায়ের-এর মিসর, আলেকজান্দ্রিয়া এবং কুফাতেও কিছু কিছু জমি ছিল। বসরাতে তার কিছু বাড়িঘর ছিল। মদিনার সম্পদ থেকেও তার কিছু আয় ছিল, যা তার কাছে আসত।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮০)

যাহোক, তার সম্পদ থেকে সমুদয় ঋণ পরিশোধ করার পর অবশিষ্ট সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারীদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হয়।

মুতার্‌রেফ বলেন, একবার আমরা হযরত যুবায়েরকে বলি, হে আবু আব্দুল্লাহ্! আপনারা কোন্ উদ্দেশ্যে এসেছেন। আপনারা এক খলীফাকে হারিয়েছেন, তিনি শহীদ হয়েছেন। এখন আপনারা তার হত্যার প্রতিশোধের দাবি উত্থাপন করছেন। হযরত যুবায়ের (রা.) বলেন, আমরা মহানবী (সা.), হযরত আবু বকর, হযরত উমর এবং হযরত উসমান গনী (রা.)-এর যুগে পবিত্র কুরআনের এ আয়াত পাঠ করতাম, وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً (সূরা আনফাল: ২৬) অর্থাৎ, তোমরা সেই ফিতনাকে ভয় কর যা শুধু তোমাদের সীমালঙ্ঘনকারীদেরই প্রভাবিত করবে না, বরং তা হবে সার্বজনীন। কিন্তু আমরা মনে করতাম না যে, তা আমাদের ওপরও বর্তাবে, আর আমাদের ওপরই এ পরীক্ষা এসে যাবে।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বাল, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৫১)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর খিলাফত নির্বাচনের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, যখন হযরত উসমানের শাহাদাতের ঘটনা ঘটে তখন মদিনায় অবস্থানরত সাহাবীগণ মুসলমানদের ভেতর নৈরাজ্য বৃদ্ধি পেতে দেখে হযরত আলীর উপর মানুষের বয়আত নেওয়ার বিষয়ে চাপ সৃষ্টি করে। অন্যদিকে কিছু দুষ্কৃতকারী কোনভাবে হযরত আলীর কাছে গিয়ে বলে যে, এখন ইসলামী রাষ্ট্র ভেঙে পড়ার মারাত্মক আশঙ্কা রয়েছে। আপনি মানুষের বয়আত নিন যেন তাদের ভয় দূর হয় এবং শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। মোটকথা তিনি বেশ কয়েকবার অস্বীকার করেন কিন্তু যখন তাকে বয়আত গ্রহণের জন্য বাধ্য করা হয় তিনি এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং মানুষের বয়আত নেওয়া আরম্ভ করেন। কয়েকজন জ্যেষ্ঠ সাহাবী তখন মদিনার বাইরে ছিলেন। কয়েকজনের কাছ থেকে জোর করে বয়আত নেওয়া হয়। যেমন হযরত তালহা এবং হযরত যুবায়ের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের কাছে হাকীম বিন জাব্‌লা এবং মালেক বিন আশতারকে কতিপয় ব্যক্তিসহ পাঠানো হয় এবং তারা তরবারির ভয় দেখিয়ে তাদেরকে বয়আত করতে বাধ্য করেন। অর্থাৎ তারা তরবারি তাক করে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে যায় এবং বলে যে, হযরত আলীর বয়আত কর, নয়তো এক্ষুণি আমরা তোমাদেরকে হত্যা করব। এমনকি কোন কোন বর্ণনানুসারে, তারা তাদেরকে একান্ত জোরপূর্বক মাটিতে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসে। জানা কথা যে, এ ধরনের বয়আত কোন বয়আত বলে আখ্যায়িত হতে পারে না। অতঃপর যখন তারা বয়আত করেন তখন এটিও বলেন যে, আমরা এই শর্তে আপনার বয়আত করছি যে, আপনি হযরত উসমানের হত্যাকারীদের উপযুক্ত শাস্তি দিবেন। কিন্তু পরবর্তীতে তারা যখন দেখেন যে, হযরত আলী হত্যাকারীদের দ্রুত শাস্তির ব্যবস্থা করছেন না, তখন তারা বয়আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান এবং মদিনা থেকে মক্কায় চলে যান। যারা হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল তাদেরই একটি দল হযরত আয়েশা (রা.)-কে হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার প্রতিশোধের মানসে জিহাদের ঘোষণা দেওয়ার জন্য রাজি করে নেয় আর তিনি (রা.) এর ঘোষণা দেন এবং সাহাবীদেরকে তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। হযরত তালহা (রা.) এবং হযরত যুবায়ের (রা.)ও তাঁর সাথে যুক্ত হয়ে যান। এর ফলে হযরত আলী (রা.)-এর সাথে হযরত আয়েশা (রা.), হযরত তালহা (রা.) ও হযরত যুবায়ের (রা.)-এর যুদ্ধ হয়, যেটিকে উষ্ট্রীর যুদ্ধ বলা হয়। এ যুদ্ধের প্রারম্ভেই হযরত যুবায়ের (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর মুখে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর একটি ভবিষ্যদ্বাণী শুনে পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ হযরত যুবায়ের (রা.) শুরুতেই পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন, এবং তিনি হযরত আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করার শপথ করেন আর এ কথা স্বীকার করেন যে, তিনি কথার অর্থ করতে ভুল করেছেন। অর্থাৎ ভুল বুঝেছেন। অপরদিকে হযরত তালহা (রা.)ও মৃত্যু বরণের পূর্বে হযরত আলী (রা.)-এর বয়আতের ঘোষণা দেন, কেননা রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (রা.) আঘাতের তীব্রতায় ছটফট করছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি তার পাশ দিয়ে যায় আর তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কোন দলের লোক? উত্তরে সে ব্যক্তি বলে, হযরত আলী (রা.)-এর দলের। এতে তিনি (রা.) নিজের হাত তার হাতে রেখে বলেন, তোমার হাত হযরত আলী (রা.)-এর হাত আর আমি তোমার হাতে দ্বিতীয়বার হযরত আলী (রা.)-এর বয়আত করছি।

(আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৫, খিলাফতে রাশেদা, পৃ: ৪৪-৪৫)

যাহোক হযরত যুবায়ের (রা.) সম্পর্কে লিখিত আছে যে, হযরত যুবায়ের (রা.)-এর শাহাদাত হয়েছে উষ্ট্রীর যুদ্ধ (ত্যাগ করে) ফিরে যাওয়ার পথে। সেখান থেকে তিনি পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন এবং হযরত আলী (রা.)-এর সাথে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তিনি (রা.) বলেছিলেন, আমি ভুল করেছি, আর এ (যুদ্ধ) থেকে তিনি পুরোপুরি পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন। উষ্ট্রীর যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে তিনি শহীদ হন। যখন হযরত আলী (রা.) তাকে স্মরণ করিয়ে বলেন, আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়ে বলছি যে, তুমি কি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে একথা বলতে শুনেছ যে, তুমি আলীর সাথে যুদ্ধ করবে আর অন্যায় হবে তোমার পক্ষ থেকে? তিনি বলেন, হঁ্যা, আর একথা আমার এখনই মনে পড়েছে। এরপর তিনি সেখান থেকে চলে যান। হযরত আলী (রা.)-এর সাথে যুদ্ধ না করার এটিই কারণ ছিল। হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.)-এর স্মৃতিচারণের সময় এর বিশদ বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে, যা থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, এটি ছিল নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী এবং মুনাফেকদের প্রজ্জ্বলিত আগুন যাতে অধিকাংশ সাহাবী ভুল বোঝাবুঝির কারণে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। যাহোক, যা-ই হয়ে থাকুক তা ভুল হয়েছিল।

হারব বিন আবুল আসওয়াদ বলেন, হযরত আলী এবং হযরত যুবায়ের (রা.)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। নিজ বাহনে আরোহন করে হযরত যুবায়ের (রা.) যখন সারিগুলো ভেদ করে ফিরে আসেন তখন তার ছেলে আব্দুল্লাহ্ তার সামনে দাঁড়িয়ে বলেন, আপনার কী হয়েছে? উত্তরে হযরত যুবায়ের (রা.) তাকে বলেন, হযরত আলী (রা.) আমাকে একটি হাদীস স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যা আমি নিজ কানে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পবিত্র মুখ থেকে শুনেছি। তিনি (সা.) বলেছিলেন, তুমি তার অর্থাৎ হযরত আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে আর এ যুদ্ধে তুমি অন্যায়ের পক্ষে থাকবে। এজন্য আমি তার সাথে যুদ্ধ করব না। তার ছেলে তাকে বলেন, আপনি তো মানুষের মাঝে সন্ধি স্থাপনের উদ্দেশ্যে এসেছেন আর এ বিষয়ে আল্লাহ্ আপনার মাধ্যমে সন্ধি করাবেন। হযরত যুবায়ের (রা.) বলেন, আমি তো কসম খেয়েছি। এতে হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা.) বলেন, আপনি এই শপথের কাফ্‌ফারা বা প্রায়শ্চিত্ত আদায় করে আপনার কৃতদাস জারজাসকে মুক্ত করে দিন এবং এখানেই অবস্থান করুন, যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'লা মানুষের মাঝে সন্ধি করিয়ে দেন। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত যুবায়ের (রা.) তার কৃতদাস জারজাসকে মুক্ত করে সেখানেই অবস্থান করেন, কিন্তু মানুষের মাঝে মতভেদ আরো বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি (রা.) তার বাহনে আরোহণ করে সেখান থেকে প্রস্থান করেন। মদিনায় ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে হযরত যুবায়ের (রা.) যখন বাসরার নিকটবর্তী সাফওয়ান নামক স্থানে পৌঁছেন তখন বানু মুজাশা গোত্রের বকর নামের এক ব্যক্তির সাথে হযরত যুবায়ের (রা.)-এর সাক্ষাৎ হয়। সে বলে, হে রসূলুল্লাহ্‌র হাওয়ারী! আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আপনার নিরাপত্তার সমস্ত দায়দায়িত্ব আমি নিচ্ছি, কেউ আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। সেই ব্যক্তিও হযরত যুবায়ের (রা.)-এর সাথে রওয়ানা হয় এবং আহ্‌নাফ বিন কায়েস নামের এক ব্যক্তির সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়। সে বলে, ইনি হচ্ছেন যুবায়ের, তার সাথে আমার সাফওয়ান-এ সাক্ষাৎ হয়েছে। তখন আহ্‌নাফ বলে, মুসলমানদের দুই দল পরস্পরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত এবং তরবারি দিয়ে একে অন্যের শিরোচ্ছেদ করছে আর উনি যাচ্ছেন তার পুত্র ও পরিবার-পরিজনের সাথে সাক্ষাৎ করতে! উমায়ের বিন জারমূয, ফাযালাহ্ বিন হাবেস এবং নুফায়েল একথা

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" কুরআন এবং রসুল করীম (সা.)-এর প্রতি সত্যিকার ভালবাসা এবং প্রকৃত আনুগত্য মানুষকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে।"

(আঞ্জামে আথাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৩৪৫)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

শোনার পর বাহনে আরোহন করে হযরত যুবায়ের (রা.) –এর পিছু নেয় এবং তাকে একটি কাফেলার সাথে ধরে ফেলে। উমায়ের বিন জারমূয ঘোড়ায় বসে পিছন থেকে এসে হযরত যুবায়ের (রা.) –এর ওপর বর্শার হামলা চালায় এবং তাকে সামান্য আহত করে। হযরত যুবায়ের (রা.)ও তার ওপর পাল্টা আক্রমণ করেন আর তখন তিনি 'যুল খিমার' নামক ঘোড়ায় আরোহিত ছিলেন। ইবনে জারমূয যখন বুঝতে পারে যে, এখন সে মারা পরবে, তখন সে তার অপর দুই সঙ্গীকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করে আর তারা সম্মিলিতভাবে হযরত যুবায়ের (রা.)–এর ওপর আক্রমণ করে এবং তাকে শহীদ করে।

এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত যুবায়ের (রা.) তার হত্যাকারীর মুখোমুখি হবার পর তাকে ধরাশায়ীও করে ফেলেন, তখন সেই শত্রু বলে, আমি আপনাকে আল্লাহ্‌র দোহাই দিচ্ছি। একথা শুনে হযরত যুবায়ের (রা.) থেমে যান। এই ব্যক্তি কয়েকবার এ কাজ করে। কিন্তু সে যখন হযরত যুবায়ের (রা.)–এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে আর তাকে আহত করে, তখন হযরত যুবায়ের (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তোকে ধ্বংস করুন। তুই আমাকে আল্লাহ্‌র দোহাই দিচ্ছিলি, কিন্তু নিজে তাঁকে ভুলে গিয়েছিস। হযরত যুবায়ের (রা.)–কে শহীদ করার পর ইবনে জারমূয হযরত যুবায়ের (রা.)–এর ছিন্ন –মস্তক ও তার তরবারি নিয়ে হযরত আলী (রা.)–এর কাছে আসে। হযরত আলী (রা.) তরবারিটি নিয়ে নেওয়ার পর বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! এটি সেই তরবারি যার দ্বারা রসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর পবিত্র চেহারা থেকে উৎকণ্ঠার ছাপ দূর হয়েছে, কিন্তু এখন এটি মরণ ও নৈরাজ্যের মৃত্যুপুরীতে রয়েছে। ইবনে জারমূয ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে প্রহরী [হযরত আলী (রা.)–এর নিকট] নিবেদন করে, হযরত যুবায়ের (রা.)–এর হত্যাকারী ইবনে জারমূয দরজায় দাঁড়িয়ে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করছে। উত্তরে হযরত আলী (রা.) বলেন, হযরত যুবায়ের (রা.)–এর হত্যাকারী ইবনে সাফিয়া জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হোক। আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক নবীরই হাওয়ারী রয়েছে আর আমার হাওয়ারী হলো যুবায়ের। হযরত যুবায়ের (রা.)–কে 'সিওয়া' উপত্যকায় দাফন করা হয়েছে। হযরত আলী (রা.) এবং তার সাথিরা বসে তার জন্য অশ্রুবিসর্জন দেন। শাহাদাতের সময় হযরত যুবায়ের (রা.)–এর বয়স ছিল ৬৪ বছর। তবে কারো কারো মতে তার বয়স ছিল ৬৬ কিংবা ৬৭ বছর।

(মুসতাদরিক আলাস সালেহীন লিল হাকিম, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪১৩) (আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫১৬) (মুসতাদরিক আলাস সালেহীন লিল হাকিম, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪১২) (আত্তাবাকাতুল কুবরা ,৩য় খণ্ড, পৃ: ৪১২) (আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮৩) (আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৬০)

হযরত আতেকা বিনতে যায়েদ (রা.) হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.)–এর সহধর্মিনী ছিলেন। মদিনাবাসীরা তার সম্পর্কে বলত, যে ব্যক্তি শাহাদাত বরণের আকাঙ্ক্ষা করে সে যেন আতেকা বিনতে যায়েদ (রা.)–কে বিয়ে করে। সর্বপ্রথম তিনি আব্দুল্লাহ্ বিন আবি বকর (রা.)–এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি শহীদ হয়ে তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। এরপর তিনি হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)–এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনিও শহীদ হয়ে তার কাছ থেকে আলাদা হয়ে যান। পরবর্তীতে হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.)–এর সাথে তার বিয়ে হয়, আর তিনিও শহীদ হয়ে তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হন।হযরত যুবায়ের (রা.) শাহাদত বরণের পর হযরত আতেকা (রা.) নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো বলেছিলেন,

غَدَرَ ابْنُ جُرْمُوزٍ بِفَارِسِ بُهْمَةٍ ... يَوْمَ اللِّقَاءِ وَ كَانَ غَيْرَ مُعَرَّدِ
يَا عَمْرُو لَوْ نَبَّهْتَهُ لَوَجَدْتَهُ ... لَا طَائِشًا رَعِشَ الْجَنَانِ وَلَا الْيَدِ
شَلَّتْ يَمِيْنُكَ إِنْ قَتَلْتَ لَمُسْلِمًا ... حَلَّتْ عَلَيْكَ عُقُوْبَةُ الْمُتَعَمِّدِ
ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ هَلْ ظَفِرْتَ بِمِثْلِهِ ... فِيْمَنْ مَضٰى فِيْمَا تَرُوْحُ وَ تَغْتَدِيْ
كَمْ غَمْرَةٍ قَدْ خَاضَهَا لَمْ يَثْنِهِ ... عَنْهَا طِرَادُكَ يَا ابْنَ فَقْعِ الْقَرْدَدِ

গাদারাব্‌নু জারমুজিন বিফারিসি বুহ্‌মাহ,
ইয়াওমাল্ লিকায়ে ওয়া কানা গাইরা মুআর্‌রেদ
ইয়া আমরু লাও নাব্বাহ্ তাহু লাওয়াজাদ্‌তাহু,
লা তায়েশান রায়েশাল জানানে ওয়া লালইয়াদ
শাল্লাত ইয়ামিনুকা ইন কাতালতা লামুসলিমান,
হাল্লাত আলাইকা উকুবাতুল মুতাআম্মেদি

সাকেলাতকা উম্মুকা হাল যুফেরতা বিমিসলেহি,
ফিমান মাযা ফিমা তারুহু ওয়া তাকতাদি
কাম গামরাতিন কাদ গাযাহা লাম ইয়ুসনেহ,
আনহা তিরাদুকা ইয়াবনা ফাকে' কারদাদি

অর্থাৎ, যুদ্ধের দিন ইবনে জারমূয সেই বীর আরোহীর সাথে প্রতারণা করেছে, অথচ তিনি পলায়নকারী ছিলেন না। হে আমর বিন জারমূয! তুমি যদি তাকে অবগত করতে তাহলে তুমি তাকে এমন কাপুরুষের ন্যায় পেতে না যার অন্তর ও হাত কাঁপে, তোমার হাত বিকল হোক কেননা তুমি একজন মুসলমানকে হত্যা করেছ। ইচ্ছাকৃত হত্যার অপরাধের শাস্তি তোমার ওপর ধার্য হয়েছে। তুমি ধ্বংস হও। সেই যুগে যারা বিদায় নিয়েছে, তাদের মাঝে কি কখনো এই ব্যক্তির মতো অন্য কারো ওপর তুমি সফল হয়েছ যাদের মাঝে তুমি সকাল সন্ধ্যা কর? হে সেই ব্যক্তি যে সামান্য কষ্টও সহ্য করতে পারে না! যুবায়ের তো এমন ব্যক্তি ছিলেন যে, পরিস্থিতি যতই কঠিন হোক না কেন তিনি যুদ্ধরত থাকতেন। আর হে গৌর বর্ণের মানুষ! তোমার বর্শা নিক্ষেপ তার কিছুই করতে পারত না।

(আততাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮৪)

তাবাকাতুল কুবরা গ্রন্থের বর্ণনা অনুসারে ইবনে জারমূয হযরত আলী (রা.)–এর কাছে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলে হযরত আলী (রা.) তাকে (তার কাছ থেকে) দূরে রাখতে চেয়েছেন অর্থাৎ তার সাথে দেখা করতে চান নি। এতে সে বলে, যুবায়ের কি বিপদের কারণ ছিলেন না? হযরত আলী (রা.) বলেন, তোমার মুখে ছাই। আমি তো আশা করি, তালহা এবং যুবায়ের সেই সমস্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হবেন যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ (সূরা হিজর: ৪৮)

অর্থাৎ, আমরা তাদের হৃদয়ের যাবতীয় বিদ্বেষ দূর করে দিব; তারা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে মুখোমুখি আসনে (উপবিষ্ট) থাকবে।

(আততাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮৪)

হযরত যুবায়ের (রা.) বিভিন্ন সময়ে বেশ কয়েকটি বিয়ে করেন এবং তাঁদের গর্ভে অনেক সন্তানসন্ততির জন্ম হয়। এর বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ–হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা.), যার গর্ভে আব্দুল্লাহ্, উরওয়া, মুনযের, আসেম, খাদিজাতুল কুবরা, উম্মুল হাসান ও আয়েশা জন্মগ্রহণ করেন। হযরত উম্মে খালেদ (রা.), যার গর্ভে খালেদ, আমর, হাবীবা, সওদা এবং হিন্দ জন্মগ্রহণ করেন। হযরত যুবাব বিন উনায়েফ (রা.), যার গর্ভে মুসআব, হামযা ও রামলা জন্মগ্রহণ করেন। হযরত যয়নব উম্মে জা'ফর বিনতে মারসাদ (রা.), যার গর্ভে উবায়দা এবং জা'ফর জন্মগ্রহণ করেন। হযরত উম্মে কুলসুম বিন আকওয়া (রা.), যার গর্ভে যয়নব জন্মগ্রহণ করেন। হযরত হেলাল বিন কায়েস (রা.), যার গর্ভে খাদিজাতুস্ সুগরা জন্মগ্রহণ করেন। (আর ছিলেন) হযরত আতেকা বিনতে যায়েদ (রা.)। হযরত যুবায়ের (রা.)–এর সমস্ত বৃত্তান্ত এখানেই সমাপ্ত হলো।

(আততাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮৩)

এর পর আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করব এবং জুমুআর নামাযের পর তাদের জানাযাও পড়াব। তাদের মধ্যে প্রথম স্মৃতিচারণ হচ্ছে, গাম্বিয়ার নায়েব আমীর তিন আলহাজ্বী ইব্রাহীম মুবায়ে' সাহেবের, যিনি গত ১০ আগস্ট তারিখে মৃত্যু বরণ করেন। **ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।**

তিনি ১৯৪৪ সানের ৪ঠা জুন 'বাঞ্জুল'–এ জন্মগ্রহণ করেন এবং (গাম্বিয়া) জামা'তের সাবেক আমীর মরহুম জনাব চৌধুরী শরীফ আহমদ সাহেবের যুগে ৬১–৬২ সালে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন। (তিনি) উক্ত জামা'তের প্রাথমিক সদস্যদের একজন ছিলেন। নিয়মিত পাঁচবেলার নামায এবং তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ওসীয়্যতকারীও ছিলেন। আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে সর্বদা অগ্রগামী থাকতেন। তার ছেলে বর্ণনা করেন, তিনি মৃত্যুর পূর্বেও তাহাজ্জুদ নামায পড়েছিলেন। পান করার জন্য পানি চেয়েছিলেন, আর এরপর আল্লাহ্ তা'লার দরবারে

রসুলের বাণী

আঁ হযরত (সা.)বলেছেন, "মানুষ যখন তওবা করে, অনুতপ্ত হয় এবং আল্লাহর একত্ব স্বীকার করে, তখন তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

(সহী বুখারী, কিতাবুল লিবাস, বাবুস সিয়াবুল বাইয)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad

উপস্থিত হন। মরহুম পবিত্র কুরআনের প্রেমিক ছিলেন, নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করতেন। মরহুম দীর্ঘদিন নায়েব আমীর হিসেবে ধর্মসেবার সৌভাগ্য লাভ করেন। এর পাশাপাশি অফিসার সালানা জলসা, ন্যাশনাল সেক্রেটারী উমুরে খারেজা এবং গাম্বিয়ার মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র সদর হিসেবেও কাজ করার তৌফিক পেয়েছেন। এছাড়া মসরূর সেকেন্ডারী স্কুলের বোর্ড সদস্যও ছিলেন।

অভিজ্ঞ শিক্ষক ছিলেন, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি নিজের পেশায় উচ্চশিক্ষা এবং মাস্টার্স করার জন্য আমেরিকা গমন করেন, এরপর ফিরে এসে দেশ ও জাতির সেবা করেন। গাম্বিয়ার একটি প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান ম্যানেজমেন্ট ডেভলপমেন্ট ইন্সটিটিউট-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের একজন ছিলেন। গাম্বিয়াতে এই প্রতিষ্ঠানটি উচ্চ পদস্থ সিভিল সারভেন্ট ও অন্যান্য লোকদের উচ্চশিক্ষা দিয়ে থাকে। গাম্বিয়ার অনেক সরকারী উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এই প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা করেছেন। প্রয়াত হাজী সাহেব তাহের আহমদীয়া মুসলিম সিনিয়র স্কুলের অধ্যক্ষ এবং নুসরত সিনিয়র সেকেন্ডারী স্কুলের প্রধান শিক্ষকও ছিলেন। অনেক দেশী-বিদেশী শিক্ষার্থীকে তিনি পড়িয়েছেন। অধিকাংশ শিক্ষিত মহলে তাকে অনেক বড় মাপের (মানুষ) জ্ঞান করা হতো এবং মানুষ তাকে গু ঞবধপযবৎ (অর্থাৎ আমার শিক্ষক) বলে অভিহিত করত। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে দু'জন স্ত্রী এবং সাতজন পুত্র আর দু'জন কন্যা রয়েছে। তার একজন স্ত্রী মুসুকীবা সাহেবা গাম্বিয়ার লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সদর এবং তার এক পুত্র ওয়াক্‌ফে জিন্দেগী, যিনি জামেয়াতুল মুবাশ্বেরীন থেকে পাশ করেছেন। একইভাবে তার আরেক পুত্র খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর ছিলেন। মরহুমের দুই ছেলে আমেরিকাতে আর এক মেয়ে এখানে যুক্তরাজ্যে বসবাস করেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি দয়া ও ক্ষমাসুলভ আচরণ করুন আর তার সন্তানদেরও তার আকাঙ্ক্ষানুসারে সর্বদা ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন।

গাম্বিয়ার আমীর সাহেব লিখেন, অধমও ক্রাব আইল্যান্ডের মিডল স্কুল বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তার শিষ্য ছিল। এখানে সকল আহমদী শিক্ষার্থী অন্যান্য মুসলমান শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে বৃহস্পতিবার ইসলামীয়াত বিষয়ে একটি ক্লাস শুরু করেছিল আর মরহুম এই ক্লাসটি করাতেন। প্রয়াত হাজী সাহেব জামা'তের ব্যবস্থাপনা ও কর্মকর্তাদের অত্যন্ত সম্মান করতেন। (আমীর সাহেব) বলেন, (মরহুম) আমার শিক্ষক ছিলেন তদুপরি আমীর হিসেবে সর্বদা আমার এবং অন্যান্য কর্মকর্তার পরিপূর্ণ আনুগত্য করেছেন। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, পরিশ্রমী এবং মুক্ত মনের অধিকারী ছিলেন। খিলাফতের প্রতি বিশ্বস্ত ও অনুগত ছিলেন। যুগ খলীফার প্রতি ভালোবাসা ও প্রেমময় সম্পর্ক ছিল। সর্বদা জামা'ত এবং খিলাফতের প্রতিরক্ষায় অগ্রগামী থাকতেন। খুবই ভালো ধর্মীয় জ্ঞান রাখতেন, যুক্তি-প্রমাণের আলোকে ও প্রজ্ঞার সাথে কথা বলতেন। আর আধুনিক প্রযুক্তি ও বিভিন্ন মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) -এর বার্তাও পৌঁছানোর চেষ্টা করতেন, তবলীগে রত থাকতেন।

দ্বিতীয় জানাযা হলো, করাচীর নায়েব আমীর আব্দুল জলীল খান সাহেবের পুত্র জনাব নঈম আহমদ খান সাহেবের। তিনি মারা গেছেন প্রায় দু'তিন মাস হয়ে গেছে, এপ্রিলের শেষ দিকে তিনি মৃত্যু বরণ করেছিলেন, **ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।** তার বংশে সর্বপ্রথম মোহতরম আখতার আলী সাহেবের মাধ্যমে আহমদীয়াত এসেছে, যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মৌলভী হাসান আলী ভাগলপুরী সাহেবের মাধ্যমে বয়আত করেছিলেন। মৌলভী আখতার আলী সাহেব মরহুমের মায়ের মামা এবং পিতার ফুফা ছিলেন। নাঈম খান সাহেব ভারতের বিহারের পাটনা থেকে মেট্রিক পাশ করেন আর পাকিস্তান হওয়ার পর ১৯৪৮ সনে লাহোরে চলে আসেন। দিয়াল সিং কলেজ থেকে তিনি ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন এবং লাহোরের টি আই কলেজ থেকে এমএসসি পাশ করেন। পরবর্তীতে তিনি লন্ডন চলে যান এবং ১৯৫৯ সনে ফিরে আসেন। ফিরে আসার পর করাচীতে গ্যাস কোম্পানিতে চাকুরি গ্রহণ করেন এবং ১৯৯৩ সনে সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার পদে থাকা অবস্থায় সেখান থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

করাচীর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ায় সানাত ও তিজারত বিভাগের নায়েব নাযেম হিসেবে জামা'তী সেবা আরম্ভ করেন। এরপর করাচীর স্থানীয় মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার নায়েব কায়েদ হিসেবে নিযুক্তি পান। অতঃপর ৬৬ সনে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া করাচীর কায়েদ নির্বাচিত হন এবং চার বছর পর্যন্ত উক্ত পদে দায়িত্ব পালন করেন। করাচীর মার্টন রোড আনসারুল্লাহ্‌র যয়ীমে আলা ছিলেন। অতঃপর করাচী জেলার নাযেম আনসারুল্লাহ্ -ও ছিলেন এবং ৯৭ সন পর্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৯৭ সনে তিনি করাচীর আঞ্চলিক নাযেম আনসারুল্লাহ্ নিযুক্ত হন। এরপর তিনি করাচী জামা'তের সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ নিযুক্ত হন এবং ২০১৯ সন পর্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল করাচী জামা'তের নায়েব আমীর হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। এছাড়া মরহুম ফযলে উমর ফাউন্ডেশন-এর ডাইরেক্টর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব আহমদীয়া আর্কিটেক্টস ইঞ্জিনিয়ারস (আহমদী স্থপতি ও প্রকৌশলীদের আন্তর্জাতিক সংঘ)-এর প্রথম মজলিসে আমেলায় অডিটর হিসেবে সেবা করেছেন। বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত এর করাচী চ্যাপ্টারের প্রধানও ছিলেন। ১৯৭০ সনে দারুয্ যিয়াফত রাবওয়ার জন্য, বরং জলসা সালানার জন্য রুটি বানানোর মেশিন বসানোর পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয় এবং মেশিন বানানো আরম্ভ হয়। তখন তিনি প্রকৌশলী হিসেবে উক্ত কাজে অংশগ্রহণের সম্মান লাভ করেন।

নাঈম খান সাহেবের স্ত্রী অনেক আগেই মৃত্যু বরণ করেছেন । তার কন্যা আম্মারা সাহেবা লিখেন, আমাদের পিতা আমাদের মায়ের মৃত্যুর পর একজন স্নেহশীল পিতার পাশাপাশি দেখাশোনাকারী মা এবং সহানুভূতিশীল বন্ধুর ভূমিকাও উত্তমরূপে পালন করেছেন। সর্বদা ধর্ম, খিলাফতের প্রতি বিশ্বস্ততা, নামাযে সময়ানুবর্তীতা এবং জামা'তের সাথে সম্পর্ক রক্ষার শিক্ষা প্রদান করেছেন। তার জামাতা ডাক্তার গাফ্‌ফার সাহেব বলেন, তার সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক হয়েছিল ত্রিশ বছর পূর্বে। এই ত্রিশ বছরে মরহুমকে অনেক কাছ থেকে দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। তার নৈকট্য এবং সাহচর্য আমার জীবনে একান্ত ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। মরহুমের রীতিনীতি একান্ত পবিত্র এবং সরলতায় সমৃদ্ধ ছিল। ইবাদতের প্রতি তার মাঝে ঈর্ষণীয় একাগ্রতা ছিল। তাহাজ্জুদ আদায় তার নিয়মিত অভ্যাস ছিল। শেষ দিনগুলোতে যখন পক্ষাঘাতের কারণে নিজে চলাফেরা করতে পারতেন না তখনও নিজের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে সামান্য পরিমাণ পরিবর্তন আসতে দেন নি আর তার যে পুরুষ নার্স ছিল , তাকে বলে রেখেছিলেন যে, আমাকে অমুক সময় উঠিয়ে বসিয়ে দিবে, আর এরপর তিনি চেয়ারে বসে রীতিমতো তাহাজ্জুদের মাধ্যমে আরম্ভ করতেন, নামায পড়তেন এবং পক্ষাঘাতগ্রস্থ হওয়া সত্ত্বেও ল্যাপটপ-এ ধর্মীয় কাজও করে যেতেন।

জামা'তের মুরব্বী নাসিম তাবাস্‌সুম সাহেব বলেন, সর্বক্ষণ তার ঠোটে হাসি লেগে থাকত। অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও অবশ্যই অফিসে আসতেন। ওয়াক্‌ফে জিন্দেগীদের অনেক ভালোবাসতেন এবং তাদের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার করতেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি মাগফিরাত ও কৃপার আচরণ করুন। তার মর্যাদা উন্নীত করুন। তার সন্তানদের তার পুণ্যকর্মসমূহ ধরে রাখার তৌফিক দান করুন। তার সম্পর্কে আরেকটি কথাও রয়েছে। নরওয়ে থেকে যারতাশ্‌ত মুনীর সাহেব লিখেন, তিনি ধর্মসেবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক সর্বদা বজায় রেখেছেন। তিনি বলেন, আমি যখন জেলা কায়েদ হিসেবে সেবারত ছিলাম, তখন তিনি খুবই উন্নত পরামর্শ প্রদান করতেন, আমাকে দিক-নির্দেশনা দিতেন। আর আমি সর্বদা তাকে দেখেছি যে, প্রত্যেক আমীরের সাথে তিনি আনুগত্য এবং সহযোগিতার উন্নত মান বজায় রেখেছেন।

পরবর্তী জানাযা হলো জার্মানীর ঠিকাদার ওলী মুহাম্মদ সাহেবের স্ত্রী মোকাররমা বুশরা বেগম সাহেবার, যিনি গত ১৯ জুলাই তারিখে ৭৪ বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে জার্মানীতে মৃত্যু বরণ করেন। **ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।**

তার দাদা নাভা নিবাসী হযরত মিয়া নিযামুদ্দীন সাহেব হযরত মসীহ্

শেষাংশ শেষের পাতায়....

বদর পত্রিকায় নিজস্ব প্রবন্ধ প্রকাশে ইচ্ছুক বন্ধুরা ই-মেলের মাধ্যমে নিজেদের লেখা পাঠাতে পারেন।

Email: banglabadar@hotmail.com

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: **Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura**

২০১৯ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ইউরোপ সফর

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণের অবশিষ্টাংশ.....

আর সঙ্গে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করার তোমাদের জন্য আবশ্যক। এছাড়াও আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা প্রতিবেশীদের অধিকার প্রদান সম্পর্কে আমাকে এত বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে আমার মনে হয়েছে, প্রতিবেশীদেরকেও হয়তো উত্তরাধিকারের অংশীদার করা হবে। কাজেই এই সীমা পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষা প্রতিবেশীদের অধিকারকে গুরুত্ব দেয়। আর রসূল করীম (সা.) এর কর্মপন্থা এবং প্রত্যেক সত্যিকার মুসলমানের কর্মপন্থা এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেয় যে তারা প্রতিবেশীদের সম্মান করে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এরপর রয়েছে মূল্যবোধের বিষয়টি। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ, লোক সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধ রয়েছে। মূল্যবোধ তো সকলেরই রয়েছে, তা প্রতিষ্ঠিত থাকা ভাল। আসল বিষয় নৈতিক মূল্যবোধ এবং উন্নত নৈতিকতা যা প্রত্যেকের সম্মিলিত সম্পদ। তাই আপনি যদি উন্নত নৈতিকতা প্রতিষ্ঠিত রাখেন, উন্নত নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত রাখেন, তবে সকলে এই এটির সমাদর করবে।প্রত্যেকের নিজের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং ধর্ম রয়েছে, যেগুলি অনুসারে তাদের সম্মানও প্রাপ্ত হবে। যদি মানবীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত থাকে, নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত থাকে তবে কখনও কোনও প্রকারের বিবাদের জন্ম হতে পারে না। পরস্পরের মধ্যে কোনও প্রকার সংঘাত হতে পারে না। কাজেই সব সময় স্মরণ রাখা উচিত, এবং আমরা যারা আহমদী, তাদেরকে চেষ্টাও করা উচিত, প্রত্যেক মানুষ চেষ্টা করে নৈতিক মূল্যবোধকে রক্ষা করার, সে ভিন্ন সংস্কৃতি এবং ভিন্ন জাতির লোক হলেও। কিন্তু প্রত্যেকের মধ্যে সদগুণ এবং অসদগুণ উভয়ই বিদ্যমান। এমনকি কিছু এমন উন্নত বৈশিষ্ট্য থাকে যেগুলিকে অন্যদের গ্রহণ করা উচিত। নবী করীম (সা.) এতদুর পর্যন্ত বলেছেন যে, উত্তম কথা তোমরা যেখানেই পাও, যে কোনও ধর্মের মধ্যে পাও, মুসলমান হওয়া আবশ্যক নয়, সে কোনও ধর্মের অনুসারী না হলেও, সেটিকে তোমার নিজের হারিয়ে যাওয়া সম্পদ হিসেবে গ্রহণ করে নাও এবং সেটি মেনে চলার চেষ্টা কর। কাজেই উন্নত মূল্যবোধ প্রত্যেকের মধ্যেই থাকে, তাই প্রত্যেক মানুষের এটির কদর করা উচিত। আর কেবল কদর করাই নয়, এগুলি গ্রহণ করাও উচিত।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, এরপর রয়েছে মহিলাদের অধিকার। এ বিষয়েও ইসলাম শিক্ষা প্রদান করেছে। ইসলাম নারীদের শিক্ষার অধিকার দিয়েছে। এরপর কুরআন করীমে একথা পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে যে মহিলাদের সঙ্গে পুরুষদের ভাল ব্যবহার করা উচিত। এছাড়া মহিলাদেরকে উত্তরাধিকার অর্জনের অধিকারও দেওয়া হয়েছে। আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, জান্নাত মায়ের পায়ের নীচে রয়েছে। অর্থাৎ মা তথা মহিলা সেই সত্তা যা সৎ শিক্ষাদীক্ষা প্রদানের মাধ্যমে সন্তানকে জান্নাতের অধিকারী করে তোলে আর পরিবেশকে জান্নাতসম বানিয়ে দেয়, সেই সমাজ, শহর ও দেশকে জান্নাতে পরিণত করে, যেখানে সে বসবাস করে। কাজেই ইসলাম মহিলাদের যে সম্মান দেয়, এবং এমন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে যেখানে মহিলারাই জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একজন পুণ্যবতী ও নীতিবান ও শিক্ষিত মহিলাই তার সন্তানের এমন লালন পালন করতে পারে যে তারা দেশ ও জাতির সেবক হতে পারে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম মহিলাদেরকেও এক মর্যাদা দান করেছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, গীর্জার মহিলা প্রতিনিধি এসেছিলেন। তিনি ধমীয় সহিষ্ণুতার কথা বলেছেন। খুব ভাল কথা। ধর্মীয় সহিষ্ণুতা অবশ্যই থাক উচিত। পূর্বেও আমি এবিষয়ের উল্লেখ করেছি যে, সব সময় একে অপরের চিন্তাধারা, ধর্ম, এমনকি যে সমস্ত সামাজিক প্রথা রয়েছে, সেগুলির প্রতিও সংবেদনশীল ও শ্রদ্ধাশীল থাকা উচিত। আর তখনই ধমীয় সহিষ্ণুতা বজায় থাকে। কুরআন করীমের প্রথম সূরায় আল্লাহ্ তা'লা লিখেছেন, 'রাব্বুল আলামীন' । তিনি খৃষ্টানদেরও প্রভুপ্রতিপালক, মুসলমানদেরও প্রভুপ্রতিপালক, ইহুদীদেরও প্রভুপ্রতিপালক, হিন্দুদেরও প্রভুপ্রতিপালক, সমস্ত ধর্মের প্রভুপ্রতিপালক, এমনকি যারা আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়, তাদেরও তিনি প্রভু প্রতিপালক। আমাদের বিশ্বাস, আল্লাহ্ তা'লা যেহেতু প্রভুপ্রতিপালক, সকলের অন্নদাতা, তাই আমরা জাগতিক বস্তুসমূহ থেকেও উপকৃত হই যা তাঁর পক্ষ থেকে লাভ হয়। ধর্ম নির্বিশেষে তিনি সকলের প্রতিপালন করছেন। তিনি যখন বলেছেন, রাব্বুল আলামীন অর্থাৎ বিশ্ব-জগতের প্রভুপ্রতিপালক, সেই সঙ্গে তিনি রহমান ও রহীম অর্থাৎ অযাচিত দাতা এবং পরম দয়াময়। তিনি অযাচিতভাবে দান করেন, মানুষের প্রতি কৃপা করেন আর যারা যাচনা করে, তাদেরকে তিনি এর থেকে অধিক পরিমাণে দিয়ে থাকেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার কেউ ইবাদত করুক বা না করুক, তাঁর কাছে কেউ যাচনা করুক বা না করুক, তাঁর অযাচিত দানশীলতার দাবি অনুসারে তিনি প্রত্যেককে নিজ বদান্যতায় ধন্য করেন এবং তার চাহিদা পূর্ণ করেন। আর যারা যাচনা করে, তাকে তিনি তার থেকে অধিক পরিমাণে দেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এরপর গীর্জার প্রতিনিধি অনেক কথা বলেছেন, যেমন, আমাদের মধ্যে বিদ্যমান মতবিরোধ, মহিলাদের সম্পর্কে বা বিভিন্ন বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। মতানৈক্য নিশ্চয় আছে, যেমনটি আমি বলেছি, প্রত্যেক ধর্মের নিজস্ব শিক্ষামালা রয়েছে। এবিষয়েও মতানৈক্য থাকে, কিন্তু আসল বিষয় দেখতে হবে যে সংকল্প বা উদ্দেশ্য কি? যদি কোথাও ইসলাম মহিলাদের সম্পর্কে কোন বিষয় না করার নির্দেশ দেয়, তবে এর উদ্দেশ্য মহিলাদের সম্মান বা মর্যাদা হানি করা নয়। বরং এর উদ্দেশ্য ছিল এর দ্বারা মহিলাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করা। যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি, এর থেকে বড় বিষয় আর কি হবে যে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, মহিলাদের পায়ের নীচে জান্নাত রয়েছে। পুরুষদের পায়ের নীচে নয়। মহিলারা এই সম্মান এই কারণে প্রাপ্ত হয়েছে, কারণ তারা সন্তানদের তদারকি করেছে এবং জাতি গঠন করেছে। একজন পুণ্যবতী মহিলার ক্রোড়ে পালিত সন্তানরা ভবিষ্যতে আইন-শৃঙ্খলার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়, তারা উন্নত নৈতিক চরিত্র প্রদর্শনকারী হয় এবং নৈতিক মূল্যবোধ রক্ষাকারী হয়। তাদের মধ্যে সহনশীলতাও থাকে, পরস্পরের ধর্মের প্রতিও সহিষ্ণু হয়। আসল জিনিস হল উদ্দেশ্য বা সংকল্প কি? আমাদের মতে উদ্দেশ্য ও সংকল্প সৎ হওয়া দরকার, কারণ এছাড়া বিভিন্ন ধর্মের শিক্ষা ভিন্ন ভিন্ন, এর জন্য প্রত্যেকের নিজের নিজের ধর্ম অবলম্বন করতে হবে, তা মেনে চলতে হবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, পৃথিবীতে ভেদাভেদ দুর করতে হলে একটি বিষয় দেখা দরকার, সেটি হল আমাদের মধ্যে সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয় কি কি রয়েছে, পার্থক্য দেখা উচিত নয়। কুরআন করীম আমাদের নির্দেশ দিয়েছে, 'কিতাবধারীদেরকেও বলে দাও, ভিন্ন ধর্মানুসারীদেরকে, অর্থাৎ ইহুদী, খৃষ্টানদের বলে দাও, এস আমরা নিজেদের মধ্যে সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে ঐক্যমতে পৌছাই। আমরা নিজেদের শিক্ষার আনুষঙ্গিক বিষয়াদির দিকে দৃষ্টি দিব না। আমরা দেখব আমাদের মধ্যে সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয় কোনটি রয়েছে। আর সেই সাদৃশ্যপূর্ণ জিনিসটি হল খোদা, যিনি একমেবদ্বিতীয়। আমরা তাঁরই উপাসনা করি, আমরা তাঁকে মান্য করি, তিনি সকলের প্রভু প্রতিপালক। এই সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়টি প্রত্যেক ধর্মের মাঝে পাওয়া যায়। আমরা যখন এই বিষয়টি অনুধাবন করতে সক্ষম হব এবং সঠিক অর্থে এক খোদার ইবাদত করব এবং উপলব্ধি করব যে সব কিছু খোদার সৃষ্টি,তখন ধর্মীয় ভেদাভেদ বা সাংস্কৃতিক ভেদাভেদ এবং অন্যান্য জাতিগত ভেদাভেদ, সমস্ত কিছুর অবসান হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, মেয়র সাহেবাও এই মানবীয় মূল্যবোধরে কথাই বলেছেন যা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি। এখন এটি এই শহর বা সেই শহরের বিষয় নয়, পৃথিবীক এক বিশ্বজনীন পল্লীর রূপ ধারণ করেছে। আর পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একদিকে যেমন আমাদের মধ্যে সহনশীলতা তৈরী করতে হবে, অপরদিকে অন্যান্য ধর্মের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাও তৈরী হতে হবে। আর এভাবেই আমরা সত্যিকার অর্থে পরস্পরের সঙ্গে শান্তি, সম্প্রীতি ও সমন্বয়ের সঙ্গে বাস করতে পারি।

হুযুর আনোয়ার বলেন, প্রাদেশিক প্রতিনিধিও স্বাধীনতার পক্ষে সওয়াল করেছেন। এগুলি খুবই ভাল কথা। আমরা এখানে এসে কেবল নিজেদের প্রয়োজনে সমাজের সঙ্গে সমন্বিত হই নি। কিছু দেশ থেকে যে সমস্ত আহমদীরা এখানে এসেছেন,তাদের অধিকাংশই সরকারি নির্যাতনের শিকার হচ্ছিলেন, তাদের ধমীয় স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছিল,তাদের একাধিক অধিকার হরণ করা হচ্ছিল,এই কারণে তারা এখানে এসেছেন। কিন্তু এখানে এসে কেবল একারণে সমন্বিত হচ্ছি না যে এখানে বিভিন্ন সুযোগসুবিধা ভোগ করছি, আর একথা প্রকাশ না করলে পাছে আমাদেরকে দেওয়া

সুযোগসুবিধাগুলি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। নিঃসন্দেহে এটিও আবশ্যক। আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ নয়,সে খোদার প্রতিও কৃতজ্ঞ নয়। অতএব, এই দিক থেকে এটি আমাদের ধর্মীয় কর্তব্যও বটে। আর আঁ হযরত (সা.) আমাদের একথাই বলেছেন যে, দেশের প্রতি ভালবাসা ঈমানের অংশ। কাজেই যে দেশ আমাদেরকে অঙ্গীভূত করেছে, যেদেশে আমরা আশ্রয় নিয়েছি, যেখনকার নাগরিকতা অর্জন করেছি, সে দেশে কিছু কিছু স্থানে আমাদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্ম শুরু হয়ে গেছে। তাই এই জার্মান দেশ এখন তাদের নিজের দেশে পরিণত হয়েছে আর এই দেশের প্রতি বিশ্বস্ততা করা, জার্মানীর আইন-শৃঙ্খলার প্রতি নিয়মনিষ্ঠতা প্রদর্শন করা, জার্মানীর প্রত্যেক নাগরিকের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা, উন্নত চরিত্র প্রদর্শন করা, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করা আবশ্যক, যাতে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত থাকে। আর দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত রাখা আমাদের ঈমানের অংশ বিশেষ, কেননা এর মাধ্যমেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হয় এবং এর দ্বারা দেশ বিভিন্ন দিক দিয়ে স্থিতিশীল হয়। কাজেই ঈমানের দাবি হল, এখন এখানে থেকে এদেশের সেবা করা। কে কোন ধর্মের বা আইন কি রয়েছে, তা না দেখে সকলের আইন মেনে চলা আবশ্যক আর প্রত্যেক প্রকৃত মুসলমানের জন্য দেশের সেবা করা আবশ্যক।

হুযুর আনোয়ার বলেন, ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। আমি পুনরায় একথাই বলব যে আমরা ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত রাখলে শান্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। আর যদি একে অপরের ধর্মকে উস্কানি দিই, তবে এর দ্বারা শান্তি প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না, অস্থিরতা তৈরী হবে। তাই এজন্য সব সময় চেষ্টা করতে থাকা জরুরী। খৃষ্টান, ইহুদী, মুসলমান, হিন্দু কিম্বা শিখ হোক বা যে কোন ধর্মের অনুসারী হোক, প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত অপরের ধর্মের সম্মান করা, তাদেরকে নিজেদের ইচ্ছে মত ধর্ম গ্রহণ করার অধিকার দেওয়া তথা ধর্মাচার প্রকাশ বা তা অনুশীলনের স্বাধীনতা দেওয়া।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, কুরআন করীম বর্ণনা করে, ধর্ম মানুষের অন্তরের বিষয়, এতে কোন জোরজবরদস্তি নেই। যেখানে বলপ্রয়োগ নেই, আর সেটি অন্তরের বিষয়, সেক্ষেত্রে প্রত্যেকের অধিকার আছে যে সে ইহুদী হতে চাইলে ইহুদী হোক, খৃষ্টান হতে চাইলে খৃষ্টান হোক কিম্বা মুসলমান হতে চাইলে মুসলমান হোক। প্রথমত একে অপরের প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষ থাকা উচিত নয়, অন্যান্য প্রকারের অন্তরায় থাকা উচিত নয়। আর এযাবৎ জার্মানী এবং পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশেরও একটি বিশেষ গুণ হল এখানে ধর্মীয় স্বাধীনতা আছে। যতদিন পর্যন্ত এই ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকবে, এখানে শান্তিও প্রতিষ্ঠিত থাকবে আর দেশের উন্নতিও অব্যাহত থাকবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, পার্লামেন্টের সদস্যরাও একথা বলেছেন যে মসজিদ শান্তির প্রতীক। তিনি মন্তব্য করেছেন যে, মসজিদ তো শান্তির প্রতীক, আর মসজিদ নির্মাণ থেকে প্রকাশ পায় যে মুসলমানেরা এখানে সমন্বিত হতে আগ্রহী। নিঃসন্দেহে মসজিদ নির্মাণ একদিকে আমাদের জন্য যেমন আনন্দের কারণ, তেমনি এর দ্বারা এবিষয়ের বহিঃপ্রকাশ হয় যে আমরা এদেশের অংশ আর মিলে মিশে এদেশের উন্নতির শরিকও হতে চাই। আর নিজেদের ধর্মীয় রীতি ও ঐতিহ্য মেনে, ধর্মের শিক্ষা অনুসারে ইবাদত করব এবং এদেশের উন্নতির জন্য যতটা সম্ভব তারা করতে চান এবং করবেন। আর এখানেই মসজিদের গুরুত্ব। কেননা, কুরআন করীম অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে যে, মসজিদের আসার পর যদি তোমরা এতীমদের যত্ন না নাও, মানবীয় মূল্যবোধের প্রতি যত্নবান না থাক, অপরকে কষ্ট দাও, তবে তোমাদের নামায, মসজিদে আসা আর এই মসজিদ নির্মাণ করা সবই অনর্থক। অতএব এই মসজিদ নির্মাণ আমাদেরকে এবিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে যে আমরা যেন এর নির্মাণের পাশাপাশি একদিকে যেমন খোদা তা'লার ইবাদতে উন্নতি করি, তেমনি অপরের ভাবাবেগের প্রতিও যত্নবান থাকা উচিত। কেউ যে কোনও ধর্মের অনুসারী হোক বা ধর্মহীন হোক, তার ভাবাবেগের প্রতি যত্নবান থাকা উচিত। আর ধর্মীয় ভেদাভেদ প্রকাশ্যে না এনে সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়গুলিকে প্রকাশ্যে আনতে হবে। যাতে আমরা এক হয়ে কাজ করতে পারি এবং দেশ ও জাতির উন্নতির জন্য কাজ করতে পারি।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এরপর আমি আহমদীদেরকেও একথাই বলব যে, এই মসজিদ তৈরী হয়ে যাওয়ার পর এখন আপনাদের, যারা এই এলাকায় থাকেন, দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেল। আপনারা পূর্বের থেকে বেশি একথার বহিঃপ্রকাশ করুন যে, আপনারা দেশ ও জাতির প্রতি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বস্ত। আপনারা নৈতিক মূল্যবোধ রক্ষা করে থাকেন এবং এর বহিঃপ্রকাশও হয়ে থাকে এবং এগুলি মেনে চলেন। আর প্রত্যেক আহমদীকে আগের থেকে বেশি হারে একথা প্রকাশ করতে হবে যে এখন আমরা এখানে ভালবাসা,সম্প্রীতি ও সমন্বয়ের পরিবেশ তৈরী করতে আগ্রহী। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলকে এর তৌফিক দান করুন। আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

অতিথিদের প্রতিক্রিয়া:

Guido Gerdemann সাহেব বলেন: আজকের অনুষ্ঠান আমার খুব ভাল লেগেছে। হিজ হলিনেস এর ভাষণ আমার খুব ভাল লেগেছে। কেননা, তিনি সেই সব মূল্যবোধের কথাই বর্ণনা করেছেন যেগুলি আমাদের সকলের গ্রহণ করা উচিত। বর্তমান যুগে সহিষ্ণুতাপূর্ণ আচরণ এবং শান্তিপূর্ণ সহবস্থানের ন্যায় মূল্যবোধগুলি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। জামাত আহমদীয়ার ইমামের ব্যক্তিত্বে শান্তি ও সম্প্রীতির আভাস পাওয়া যায়।

জ্যান এডার্স সাহেব বলেন, আজকের অনুষ্ঠান আমার খুব পছন্দ হয়েছে। কেননা প্রথমবার আমি এমন একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছি। খলীফার ভাষণের যে কথাটি আমার ভাল লেগেছে সেটি হল তিনি নিজের ভাষনে অন্যান্য বক্তাদের কথাগুলিকেও যুক্ত করেছেন।

স্টেফান মার্ডিং সাহেব বলেন, জামাতের ইমামের ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত আকর্ষনীয় বলে মনে হয়েছে। তাঁর কথাগুলির সঙ্গে আমি একশভাগ একমত। বিশেষ করে মূল্যবোধ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্যকে আমি পুরোপুরি সমর্থন করি। কেননা এমন কথা প্রত্যেক মানুষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

উল্ফ ডড সাহেব বলেন, খলীফার ভাষণ চমৎকার ছিল। তাঁর ভাষণের সব থেকে সুন্দর দিকটি ছিল এই যে তিনি এমন দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলেছেন যা সমস্ত ধর্মকে ঐক্যবদ্ধ করবে। আমি একজন খৃষ্টান গীর্জার সদস্য আর আমাদের উপাসনা-পদ্ধতি এবং একাধিক বিষয়ে মত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও জামাতের ইমাম এমন দৃষ্টিভঙ্গির কথা বর্ণনা করেছেন যার প্রতি প্রত্যেক মানুষের সমর্থন থাকবে। আমার বিশ্বাস, আমাদের সকলের এক ও অভিন্ন খোদা, পার্থক্য কেবল উপাসনা পদ্ধতির।

ভদ্রলোক আরও বলেন, খলীফা এমন এক ব্যক্তিত্ব যাঁর উপর সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। আমি উর্দু না জানলেও তাঁর ভাষণের কথাগুলি গভীর মনোযোগ সহকারে শুনছিলাম, যাতে খলীফার কথা আমার উপর কি প্রভাব ফেলে তা বুঝতে পারি। আমাকে স্বীকার করতে হবে যে, তাঁর সত্ত্বার আমার উপর এমনই প্রভাব পড়েছিল যে, এক মুহূর্তের জন্যও সেখান থেকে উঠে অন্যত্র যাওয়া আমার কাছে দুষ্কর ছিল।

বারবারা গুন্থার সাহেবা বলেন, খলীফাকে প্রথম বার দেখে আমার মনে তাঁর প্রতি ভক্তি ভাবের উদয় হয় আর আমি অনুভব করলাম যেন তিনি অত্যন্ত সম্মানীয় ব্যক্তি। খলীফার ভাষনের একটি কথা আমার খুব পছন্দ হয়েছে যা আমাদের সকলের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত এবং কর্মযোগে প্রয়োগ করা উচিত, সেটি হল এই যে, আমাদের সেই সব বিষয়ের উপর মনোযোগ দেওয়া উচিত যেগুলি সমন্বয় সৃষ্টি করে আর এভাবে আমাদের মধ্যে একতা সৃষ্টি হবে।

কাই ভগেল সাহেব,যিনি স্থানীয় এসেম্বলীর সদস্য, তিনি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, আমি আজকের এই অনুষ্ঠানে যোগদান করে ভীষণ আনন্দিত। কেননা, এই মসজিদের উদ্বোধন কেবল জামাত আহমদীয়ার সদস্যরাই নয়, বরং এতদঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য আনন্দের কারণ। খলীফাকে দেখেই বোঝা যায় যে তিনি একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। আমার মতে, খৃষ্টানদের জন্য ক্যাথলিক পোপের যে মর্যাদা, অনুরূপভাবে আহমদীয়া জামাতের কাছে খলীফার মর্যাদা। এমন এক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পাওয়া আমার কাছে অত্যন্ত সম্মানের বিষয়। এই সাক্ষাত আমার কাছে অত্যন্ত আশিসময় বলে মনে হয়েছে। এছাড়া খলীফার ভাষণে আমাকে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি মনে হয়েছে, সেটি হল, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে অপরের সম্পর্কে যে রক্ষণশীল মনোভাব রয়েছে তা দূর করতে হবে। একমাত্র তখনই শান্তি প্রতিষ্ঠিত করা যাবে এবং এই যুগের যাবতীয় সমস্যাবলীর সমাধান সম্ভব হবে।

স্টেফান ওয়েবার সাহেব, যিনি স্থানীয় বিধানসভাবর সদস্য, তিনি নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেন: এই অনুষ্ঠান ব্যপকভাবে সফল হয়েছে। আপনারা প্রত্যেকের প্রতি এমন ভালবাসা ও স্নেহপূর্ণ আচরণ করছেন, খলীফার ভাষণও অতি উচ্চমানের ছিল। তিনি পূর্বের সমস্ত বক্তাদের

বক্তব্যের নির্যাস বর্ণনা করার পর নিজের মতামত যোগ করেছেন। এইভাবে ভাষণের মধ্যে একটি প্রকার কৌতূহল তৈরী করা হয়েছে। সেই কারণেই আমি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে তাঁর বক্তব্য শুনছিলাম।

এলকা ক্রিস্টিয়ানা রডার সাহেব,যিনি পাশ্ববর্তী নর্ডারস্টেডট শহরের লর্ড মেয়র পদে রয়েছেন, তিনি নিজের মতামত জানিয়ে বলেন, অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা খুব সুন্দর। আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য সব সময় কেউ না কেউ সঙ্গে থেকেছে। আমার মতে খলীফা একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। খাওয়ার টেবিলে তাঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ এসেছিল। অত্যন্ত অমায়িক ব্যক্তি। আজ এখানে তিনি যে কথা গুলি বললেন, তার দ্বারা ইসলাম সম্পর্কে অনেকের চিন্তাধারা নিশ্চয় পাল্টে গেছে, বিশেষ করে তাঁর এই বক্তব্য যে, " শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।" এজন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমি চাই, জামাত আহমদীয়ার সদস্যরা খলীফার এই বার্তাকে এবার নর্ডারস্টেড প্রদেশের অন্যান্য শহরেও পৌঁছে দিক। আজকের দিনটি আমার জন্য অত্যন্ত উপযোগী সাব্যস্ত হয়েছে, এর জন্য আমি কৃতজ্ঞ থাকব।

এঞ্জেলিকা রুবম্যান সাহেবা এবং তাঁর স্বামী কার্লহারম্যান সাহেব তাঁদের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন: আজ খলীফার উপস্থিতি অত্যন্ত আকর্ষণীয় বলে মনে হচ্ছিল। তাঁর ব্যক্তিত্ব থেকে এক প্রকার শান্তির বহিঃপ্রকাশ হয় এবং অন্যদের উপরও তা শান্তিময় প্রভাব ফেলে আর এভাবে মানুষ আন্তরিক প্রশান্তি লাভ করে। খলীফা দেখে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব বলে মনে হয়।

এঞ্জেলিকা রুবম্যান সাহেবা বলেন, এই ভাষণ থেকে আমি শিক্ষা গ্রহণ করেছি যে, দৈনন্দিন জীবনে অন্যদের প্রতি আমাদের আচরণ কি,সে বিষয়ে আমাদের ভেবে দেখা উচিত। আমাদেরকে বন্ধুবান্ধব এবং অন্যদের সহায়তা করা উচিত।

ভদ্রমহিলা একটি ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, পাঁচ বছর পূর্বে আমার স্বামী প্রথমবার ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। এক আহমদী বন্ধু বললেন, তিনি তাঁদের খলীফাকে এই বিষয়ে লিখেছেন। এরপর যখন আমার স্বামীকে পরীক্ষা করা হল, তখন ক্যান্সারের নামমাত্র ছিল না। আহমদী বন্ধুর কথা মত আমিও খলীফাকে চিঠি লিখি আর দুই সপ্তাহ পর তার উত্তর আসে। যখনই আমি সেবিষয়ে কথা বলি, আমি শিউরে উঠি। চিঠির উত্তর পাওয়ার পর আমরা দুজনে অনেক কাঁদি। এমনিতে আমরা ততটা ধর্মপ্রাণ মানুষ নই। কিন্তু এটি এমন এক ঘটনা ছিল যা আমাদেরকে প্রভাবিত করেছিল। সেই চিঠিটি সব সময় আমি সঙ্গে রাখি, কেননা, এটি আমার জন্য রক্ষক ফিরিশতার মর্যাদা রাখে। এই ঘটনার পর আমাদের মধ্যে পরিবর্তন এসেছে। আজ খলীফাকেও দেখলাম, আর পুনরায় আমরা এক রোমহর্ষক অনুভূতির মধ্যে দিয়ে অতিক্রান্ত হলাম।

টোবিয়াস ভন ডের হেইড, যিনি প্রাদেশিক বিধানসভার সদস্য, তিনি নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেন, আজকের অনুষ্ঠানে অনেক মানুষের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেলাম। যেদিকেই দৃষ্টি দিই, হাস্যোজ্জ্বল ও আনন্দময় মুখ দেখা যাচ্ছিল। খলীফার ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত প্রভাবশালী, তাঁর ভাষণও চমৎকার ছিল। তিনি নিজের ভাষণে এই বিষয়ের উপর জোর দিয়েছেন যে, এমন এক ইসলামের প্রসার ঘটা উচিত যা শান্তিপ্রিয়। খলীফা চান সমস্ত মানুষের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করতে এবং দূরত্ব ঘোচাতে। তাঁর কিছু কথা আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

মেলানি ওয়েলনডর্ফ সাহেবা নামে এক ভদ্রমহিলা বলেন, এই অনুষ্ঠানে অনেক মানুষের সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ পেয়েছি, যারা সকলের প্রতি স্নেহশীল। কিন্তু আজকে সব থেকে বেশি প্রভাবশীল এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন খলীফার সত্তা। তিনি খুবই চমৎকার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নিজের ভাষণ উপস্থাপন করেছেন।

প্রোটেস্টান্ট চার্চের পাদ্রী সুজায়েন হান সাহেবা নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেন, যেভাবে আজকের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল এবং যত সংখ্যক মানুষ এখানে একত্রিত হল, তা এই শহরে এত ব্যপক আকারে প্রথম কোনও অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল। আমি আনন্দিত যে,এখানে জামাত আহমদীয়ার মসজিদ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। খলীফা নিজের ভাষণে আমাদের সকলে বক্তব্যব্যের কথাগুলিও উল্লেখ করেছেন এবং সঙ্গে নিজের দৃষ্টিভঙ্গিও উপস্থাপন করেছেন। আমি আনন্দিত যে, তিনিও এবং আমরাও একই দাবি করি যে, খোদা এক ও অদ্বিতীয়, যিনি জগতের প্রভু। আজ এখানে খলীফার আগমণ কেবল আহমদীদের জন্যই নয়,বরং সমস্ত খৃষ্টানদের জন্যও অত্যন্ত আনন্দও সম্মানের বিষয়।

এন্টেয়া সাহেবা বলেন, আজকের অনুষ্ঠান মানুষের মনে রেখাপাত করেছে। এত মানুষের সমাগম, অথচ সমস্ত কাজ সুব্যবস্থিত এবং সুসংহত উপায়ে পরিচালিত হচ্ছে আর শান্তির পরিবেশও বজায় আছে। অন্যান্য লোকদেরও বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, যা আমার খুব ভাল লেগেছে। আর তিনি যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করছেন, সেটিও আমার ভাল লেগেছে। আমি এই প্রথম খলীফাকে দেখলাম।

এক অতিথি বলেন, আজকের অনুষ্ঠানের খলীফার ভাষণ আমার খুব পছন্দ হয়েছে, কেননা তিনি ইসলাম সম্পর্কে আমাদের অনেকগুলি সংশয় দূর করেছেন। যিনি যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সহনশীলতার বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন, তা সমস্ত ধর্মের কাছে গুরুত্বপূর্ণ।

কুইকবর্ন শহরের ভাইস মেয়র অস্ট্রিড হুয়েক সাহেবা বলেন: আমি ফিরে গিয়ে যুগ খলীফার এই কথা গুলি প্রচার করব এবং যখনই কেউ ইসলামের উপর আপত্তি করবে, তখন আমি যুগ খলীফার এই কথাগুলি তার সামনে তুলে ধরে ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রমণকে প্রতিহত করার চেষ্টা করব। যুগ খলীফা কেবল অতিথিদেরকে উদ্দেশ্য করেই ভাষণ দেন নি, বরং তিনি নিজের জামাতের সদস্যদেরকেও এবিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, তারা মসজিদ তৈরী হওয়ার পর পূর্বাপেক্ষা অধিক মানবতার সেবা করবে।

একজন দন্তচিকিৎসক বলেন, যুগ খলীফার বক্তব্যের সমস্ত বিষয়ের সঙ্গে একমত। খৃষ্টধর্মেও অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলির কথা তিনি নিজের ভাষণে উল্লেখ করেছেন। আরও একটি বিষয় আমাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে সেটি হল, আমাদের দেশের যে অশান্তি বিরাজ করছে, তার সমাধান যুগ খলীফার ভাষণে বিদ্যমান ছিল।

পেশায় উকিল ভেটিক সাহেব বলেন, জামাত আহমদীয়ার ইমামের উপস্থিতি পরিবেশের উপর এক বিস্ময়কর প্রভাব বিরাজ করছিল। তাঁর আধ্যাত্মিকতার প্রভাবের কারণে তাঁর বক্তব্য সরাসরি হৃদয়কে স্পর্শ করছিল। তিনি নিজ ভাষণে মহিলাদের মর্যাদাকে স্পষ্টরূপে তুলে ধরেছেন আর এর দ্বারা ইসলামে নারীর মর্যাদা এবং সমাজে নারীদের প্রতি সম্মানের বিষয়টি প্রকাশ্যে এসেছে।

বাওয়ার সাহেব বলেন, জামাত আহমদীয়ার সঙ্গে যখন থেকে আমার পরিচয় হয়েছে, সেদিন থেকেই জামাতের নৈতিকতা ও আচার আচরণ আমার উপর সুখকর প্রভাব ফেলেছে। কিন্তু আজ খলীফার সঙ্গে সাক্ষাত করে আমি জামাতের উন্নত আচরণের উৎস সম্পর্কেও অবগত হলাম যে এই নৈতিকতার উৎস এমন এক নেতৃত্ব যা আপনাদের সামগ্রিক প্রশিক্ষণের পিছনে সক্রিয় আছে। আমি আপনাদেরকে সৌভাগ্যবান মনে করি যে আপনাদের এমন একজন প্রতাপসম্পন্ন এবং সম্ভ্রমশালী নেতৃত্ব আছেন যিনি সর্বক্ষণ নিজের জামাতের সামাজিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক প্রতিপালনের বিষয়ে যত্নবান থাকেন। আপনাদের খলীফা থেকে এক বিচিত্র প্রকারের আধ্যাত্মিক প্রভাব প্রকাশ পায় যা অনুভব করা যায়, কিন্তু ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

ব্রেনেড ডুইঙ্গার সাহেব বলেন, আপনাদের খলীফার ভাষণ অত্যন্ত প্রভাব সৃষ্টিকারী যা মানুষের উদাসীনতার নিদ্রা ভঙ্গ করে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, তিনি নিজের ভাষণে অন্যান্য বক্তাদের মুখ্য বিষয়গুলিও উল্লেখ করেছেন। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি দ্বিপাক্ষিক সংলাপে বিশ্বাসী। আর লোকেরা যে খলীফার কথা শুনতে এখানে আসেন, তেমনি খলীফাও তাঁদের কথাকে গুরুত্ব দেন। এর থেকে প্রকাশ পায় যে, তিনি অতিথিদেরকে কিভাবে বাস্তবিকরূপে সম্মান দেন। সম্মিলিত ও সামাজিক আলোচনার জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ, যেটির বিষয়ে জামাতের ইমাম সবিশেষ যত্নবান।

মিলানী লডউইগ সাহেবা বলেন, আমি আধ্যাত্মিক সম্প্রদায়সমূহ নিয়ে গবেষণা করছি এবং আধ্যাত্মিকতার অনুশীলন করার শিক্ষা অর্জন করেছি। এখন আমি একটি স্কুলে ছাত্রদেরকে আধ্যাত্মিক চিকিৎসক হিসেবে প্রস্তুত করছি। আহমদীয়া জামাতের ইমাম আমার সামনে দিয়ে যখন অতিক্রান্ত হলেন, আমি সেই সময় একটি ভিডিও তৈরী করি, কিন্তু আমার উপর তাঁর দৃষ্টি পড়তেই আমার শরীরের যেন সমস্ত শক্তি নিঃশোষিত হয়ে আমি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। এরপর খলীফা যখন দোয়া করালেন, তখন আমার চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল, আর আমি আপ্রাণ চেষ্টায় তা

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 5 Thursday, 8 Oct, 2020 Issue No.41

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছিলাম। খলীফার উপস্থিতিতে পরিবেশের মধ্যে এক বিশেষ প্রভাব বিরাজ করছিল যা জাগতিক ছিল না, বরং এক আধ্যাত্মিক পরিস্থিতি ছিল।

যোয়াখেম টাগেট সাহেব বলেন, আপনাদের খলীফা উন্নত নৈতিকতা এবং চারিত্রিক গুণাবলী অবলম্বন করার কথা বলেছেন আর তাঁর বাচনভঙ্গি এমন অকৃত্রিম এবং সহানুভূতিপূর্ণ ছিল যে, আমরা কে এবং কোন্ ধর্মের সে কথা না ভেবে, আমার মনে হয়েছে নৈতিকতা এবং মানবতা সম্পর্কে তাঁর মূল্যবোধের দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা সকলে এক। জামাত আহমদীয়ার ইমাম অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ভাল এবং মন্দের পার্থক্য বর্ণনা করেছেন এবং এবিষেয়র প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, আমাদেরকে প্রতিবেশীদের অধিকারের প্রতি যত্নবান থাকা উচিত এবং একই পরিবারের সদস্যদের মত থাকা উচিত। খলীফার সত্তা এমন যে মনে হয় যেন তাঁর মধ্যে কোনও প্রকার কঠিনতার লেশমাত্র নেই আর তিনি ভালবাসার এক চলমান চিত্র। তাঁর প্রশিক্ষিত জামাতের সদস্যরাই তাঁর সত্যতার প্রমাণ বহন করে চলেছে, যাদের সঙ্গে আমাদের নিত্য ওঠাবসা।

মেয়র জন এলযে সাহেব বলেন: আপনাদের খলীফা যে সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করেছেন, সেগুলি আমাদের পরিবেশ ও সমাজে সার্বজনীন হওয়া দরকার। প্রত্যেক ধর্ম শান্তির ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত আর আপনাদের খলীফা নিজ ব্যক্তিত্বে শান্তিময় ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিভাত হন; তাঁর থেকে বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ পায়। খলীফা একজন সত্যবাদী মানুষ, যিনি আমার উপর নিজ সত্যতার গভীর প্রভাব ফেলেছেন।

ফ্রেডরিচ গুন্তার সাহেব বলেন: খলীফা একজন উন্মুক্তমনা ও স্বচ্ছ প্রকৃতির মানুষ, যাঁর ব্যক্তিত্বে এক আধ্যাত্মিক প্রভাব ও আকর্ষণ রয়েছে। তাঁর ব্যক্তিত্বের পবিত্রতা থেকে তাঁর কথাগুলি শক্তি লাভ করে। আমার উপলব্ধি, তাঁর বক্তব্য ও ব্যক্তিত্ব, আমাকে সমানভাবে প্রভাবিত করেছে।

এলকেশ্রাইবার সাহেবা বলেন: আমি খলীফার উপস্থিতির কারণে এতটাই প্রভাবিত হয়েছি যে, স্বতঃপ্রণোদিতভাবে আমি খলীফার সঙ্গে কথা বলতে চাই,কিন্তু আমার সাহস ছিল না। আমার টেবিলে বসে থাকা স্বাগতিক আমাকে সাহায্য করেন এবং তিনি আমাকে মঞ্চে নিয়ে যান। যখন আমি খলীফার কাছে পৌঁছি, আমার পা দুটি তখন কাঁপছিল। কিন্তু তিনি আমাকে উৎসাহিত করেন এবং আমার কথাগুলি মনোযোগ সহকারে শোনেন। আমি তাঁকে বললাম,আমার বয়স হয়েছে, জানি না জীবনে আবার সাক্ষাত করার সুযোগ পাব কি না। তাই মঞ্চে সাক্ষাত করতে এসেছি। তিনি যেভাবে আমার মনোতুষ্টি করেছেন, তা আমার চিরদিন মনে থাকবে।

মিউগিনবার্গ সাহেবা বলেন: খলীফা একজন অতীব আকর্ষণীয় সত্তা আর খলীফার প্রতি মানুষের ভালবাসা অনুভব করা যাচ্ছিল। খলীফা অন্যান্য বক্তাদের বক্তব্যও শুনেছেন এবং নোট করেছেন যা আমার খুব ভাল লেগেছে আর এর দ্বারা প্রভাবিতও হয়েছি। বর্তমান যুগে সকলে কেবল নিজের কথাই বলতে চায়, অপরের কথা শোনার রীতি নেই, আর আত্মকেন্দ্রিকতা এমন চরমে পৌঁছেছে যে, অপরের কথা শোনার সময় মনোযোগই থাকে না। কিন্তু খলীফা দ্বিপাক্ষিক সম্মান ও শ্রদ্ধার বাস্তব দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। তাই আন্তঃধর্মীয় সংলাপের ক্ষেত্রে খলীফাকে একজন আদর্শ হিসেবে গণ্য করা উচিত।

অলিভার সাহেব জিজ্ঞাসা করেন যে, হুযুর কি কেবল এই মসজিদটির উদ্বোধনের উদ্দেশ্যেই এসেছেন? যখন তাঁকে বলা হল যে হুযুর অন্যান্য মসজিদও উদ্বোধন করেছেন আর তিনি পত্রযোগে জামাতের প্রত্যেক সদস্যের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করেন, তখন তিনি ভীষণ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করেন যে, হুযুর এই সমস্ত কাজ কিভাবে করেন?

যখন তিনি একথা শুনলেন যে ফুলাডা শহরে হুযুর আনোয়ার একটি হাদীসের উল্লেখ করেছেন যাতে বলা হয়েছে যে আঁ হুযুর (সা.) একদল খৃষ্টানকে মসজিদের মধ্যে উপাসনা করার অনুমতি দান করেছিলেন, তখন তিনি নিজের ইচ্ছের কথা জানিয়ে বলেন, আমিও আপনাদের মসজিদে ইবাদত করতে আসব।

স্থানীয় নাগরিক উলরিশ লেনয সাহেব বলেন, আমি জামাতের সঙ্গে ত্রিশ বছর থেকে পরিচিত আর এযাবৎ এই জামাতের সব কিছুই ভাল লেগেছে। জামাত আহমদীয়ার ইমামের ব্যক্তিত্ব অসাধারণ আর প্রভাবসৃষ্টিকারী। কিন্তু তাঁর প্রতাপ এবং মর্যাদা এক প্রকার প্রশান্তি ও ভালবাসার সমষ্টি। তাঁর উপস্থিতিও শান্তি ও প্রেমময় প্রভাব রাখে আর প্রত্যেক ধর্মের উদ্দেশ্যই হল সার্বজনীন শান্তি।

সাবেক সাংসদ ক্যানেল সাহেবা বলেন, জামাত আহমদীয়ার ইমামের ভাষণ তৃপ্তিকর ছিল আর সামাজিক সমন্বয়ের যে পরিভাষা তিনি উপস্থাপন করেছেন তা পূর্ণাঙ্গ, সত্য ভিত্তিক এবং সম্পূর্ণ নির্ভুল।

স্টেফান লেসফিল্ড সাহেব বলেন, জামাত আহমদীয়ার ইমাম অত্যন্ত বিনয়ী ব্যক্তি। তাঁর অসাধরণ ভাষণে এ বিষয়টি প্রতিবিম্বিত হয় যে, তিনি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর গভীর দৃষ্টি রাখেন।

ফেলিক্স সাহেব বলেন: জামাত আহমদীয়ার ইমাম উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করে মনে হয়, তিনি আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিষয়াদির উপর গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপকারী একজন মর্যাদাবান ব্যক্তি। একথা স্পষ্ট যে, তিনি ধর্মের মধ্যেকার পথ খুলে দেওয়ার এবং নিজেদের মধ্যেকার রক্ষনশীল মনোভাব দূর করতে আন্তরিকভাবে আগ্রহী। এবং আন্তর্জাতিক এবং আন্তঃধর্মীয় সংলাপের জন্য গঠনমূলক পরিবেশের বিকাশ এবং এর প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেছেন।

উল্পগ্যাঙ্গা মার্কম্যান সাহেব বলেন: আমি উপলব্ধি করছি যে, হুযুর আনোয়ারের ইসলামের শান্তির বার্তা প্রসারে পৃথিবীর কোনও শক্তি বাধা দিতে পারবে না।তিনি একজন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং শক্তিশালী মানসিকতার মানুষ। তাঁর যুক্তি প্রমাণের ভিত্তি হল মানবতার জন্য প্রকৃত সহানুভূতি এবং মানবীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য নিঃস্বার্থ চেষ্টা। কে আছে এমন শক্তিশালী, পবিত্র এবং নিষ্ঠাবান ব্যক্তিকের চেষ্টাকে প্রতিহত করতে পারে?

খুতবার শেষাংশ.....

মওউদ (আ.) -এর সাহাবী ছিলেন। তিনি খুবই নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায় করতেন, সময়মতো নামায পড়তেন, অতিথিপরায়ণ ছিলেন, অভাবীদের সাহায্য করতেন, আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিলেন, পুণ্যবতী ও নিষ্ঠাবতী নারী ছিলেন। খিলাফতের প্রতি অসীম ভালোবাসা ও নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। শৈশব থেকে দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতার কারণে রীতিমতো কুরআন শরীফ পাঠ করতে পারতেন না। কিন্তু বিয়ের পর নিজ সন্তানদের সাহায্যে কয়েক পারা মুখস্থ ও করেছেন। এমটিএ-তে পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত শোনার পাশাপাশি রীতিমতো আমার খুতবাও শ্রবণ করতেন এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানও নিয়মিত দেখতেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ওসীয়্যতকারিণী ছিলেন।

তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে চার পুত্র এবং দুই কন্যা রয়েছে। এক পুত্র শফিকুর রহমান সাহেব জামা'তের মুরব্বী এবং নিউজিল্যান্ড জামা'তের মুবাল্লেগ ইনচার্য। আরেক পুত্র আতিকুর রহমান সাহেব আজকাল জীবন ওয়াকফ করে আমাদের পিএস দপ্তরের রেকর্ড বিভাগে কাজ করছেন। মিশনারী ইনচার্য শফিকুর রহমান সাহেব তার মায়ের জানাযায় অংশগ্রহণও করতে পারেন নি। তাকে এখানেই কবর দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তাকেও প্রশান্তি ও ধৈর্য প্রদান করুন এবং মরহুমার প্রতি মাগফিরাত ও কৃপার আচরণ করুন আর মরহুমার সন্তানদের তার দোয়া সমূহের উত্তরাধিকারী করুন। নামাযের পর ইনশাআল্লাহ্ আমি তাদের গায়েবানা জানাযা পড়াব।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কেরে তত্ত্বাবধানে অনূদিত)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমরা পরস্পর শীঘ্র বিবাদ মীমাংসা করে ফেল এবং নিজ ভাইয়ের অপরাধ ক্ষমা কর, কেননা যে ব্যক্তি যে নিজ ভাইয়ের সঙ্গে মীমাংসা করতে রাজি হয় না, তাকে বিচ্ছিন্ন করা হবে, সে বিভেদ সৃষ্টি করে। (কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২১)

দোয়াপ্রার্থী: **Qazi Badruddin Sb. (Neogirhat, West Bengal)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazie-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir